হিরণ্যগর্ভ
একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১লা মাঘ, ১৪২৫

Hiranyagarbha
Volume 11, No. 4
हिरण्यगर्भ
एकादश वर्ष, चतुर्थ संख्या
तारिख–१५जनवरी, २०१९

১লা মাঘ, ১৪২৫ 15th January, 2019

সূচীপত্র ▫ Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—

বিষ্ণু অবতার দত্তাত্রেয় ভগবান	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	10
শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	12
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	13
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	15
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	16
শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	17
মহাপ্রস্থানের পথে	শ্রীসৌরভ বসু	18
রেবতী নক্ষত্ররূপা কন্যা রেবতী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	20
শিবাত্মজা নর্মদা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	21
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	22
কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	23
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	25
শ্রীশ্রীমায়ের সৎসঙ্গ	শ্রীমতী অদিতি মুখোপাধ্যায়	26

हिन्दी विभाग ः—

विष्णु अवतार दत्तात्रेय भगवान	श्रीमती ज्योति पारेख	28
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	32
ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	33
श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	35
श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	36
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	37
रेवती नक्षत्ररूपा कन्या रेवती	श्रीमती ज्योति पारेख	38
महाप्रस्थान के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	39
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	42
शिवात्मजा नर्मदा	श्रीमती ज्योति पारेख	43
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	44

English Section ः—

Vishnu Avatar Dattatreya Bhagwan	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	46
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	51
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	52
Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	53
Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	55
Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	56

ISBN No. 978-81-935091-8-0

Cover : Sri Sri Dattatreya Bhagwan

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

শীতরাত্রির পৌষালী কুয়াশা যখন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে আবৃত করে রাখে কুজ্ঝটিকার মোড়কে, অখিল চরাচর শীতের চাদর গায়ে যখন হয়ে থাকে নিঝুম-নিস্তব্ধ, তখনই গীর্জায় গীর্জায় সুমধুর ঘন্টাধ্বনি বরণ করে নেয় ইংরাজী নববর্ষকে। মধ্য-রাত্রিক প্রার্থনায় জ্যোতির্ময় ঈশ্বরপুরুষ যীশুর চরণকমলে আমরা আনত হই — নতুন বছরের অনাগত দিনগুলি নতুন উদ্দীপনা, সম্ভাবনা ও সৎকর্মাদির মধ্যে যাপন করার নতুন শপথ গ্রহণ করি।

ইংরাজী নতুন বছর আমাদের আশ্রমিক জীবনে বহন করে আনে এক বিশেষ উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন। মকর-সংক্রান্তির পরম পুণ্যলগ্নে ভক্তি-বিনম্র চিত্তে আমরা পালন করব অখণ্ড মহাপীঠস্থ পুণ্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের পুণ্য অভিষেক-লগ্নের একাদশ বার্ষিকী মহোৎসব। ধূপ-দীপ-পুষ্প-ভক্তি সঙ্গীত মুখরিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে, তাঁদের রাতুল চরণে আমাদের দীন অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করে আমরা ধন্য হব।

হিরণ্যগর্ভের এই সংখ্যাটিতে শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন বিষ্ণু অংশাবতার শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় ভগবানের অলৌকিক জীবনবেধ। ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি অত্রি ও মহাসতী অনুসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয়। তিঁনি জন্মসিদ্ধ তপস্বী, আদিত্য সম ভাস্বর, মহাপ্রাজ্ঞ, যোগশাস্ত্রবেত্তা। তিঁনি পরমব্রহ্মের প্রতিভূ, স্বয়ংসিদ্ধ, আত্মজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত — একই দেহে ত্রিদেব বিভূতিযুক্ত।

আজ মকর-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি এই ব্রহ্মসদৃশ আলোকপুরুষের চরণে নিবেদন করে আমরা প্রার্থনা জানাই , "হে মহামানব! আমাদের মনের কলুষ নাশ কর — মনের অজ্ঞানতার আবরণ অপসারিত করে মানবমনে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত কর।"

— হরি ওম্ তৎ সৎ —

As the winter fog shrouds the stars in the night sky, as the nature reposes sleepily under the blanket of mist, bells chime in the churches to usher in the New Year! The devout gather in the midnight mass to prostrate their humble souls on the hallowed feet of the Lord and take vows afresh to spend the forthcoming year amidst devotion and dedicate our lives to spiritual and noble pursuits.

The New Year carries a special significance in the lives of the Ashramites and devotees here, as we prepare ourselves to observe, with utmost piety and devotion, the enthronement anniversary of the Shri Shri Guru Maharajas in Akhanda Mahapeeth. We feel deeply blessed through offering the humble homage of our hearts at Their hallowed feet.

In this edition of Hiranyagarbha, Sree Sree Maa has elaborated upon the divine life and spiritual philosophy of Bhagwan Shri Dattatreya, the enlightened son of the great sage Atri, the Manasputra of Brahma, and Anusuya, the embodiment of Mother Divine. Being an incarnation of Lord Vishnu, Saint Dattatreya was an enlightened person right from His birth, aglow with the supreme knowledge and was a great preacher of yogic truth and tenets. He was endowed with the divine power of the three Lords – Brahma, Vishnu and Shiva.

On the auspicious occasion of Makara Sankranti, we humbly dedicate this issue of Hiranyagarbha on His holy feet and beseech His blessings to lift the veil of our ignorance from our mind and kindly bless us by igniting the spark of knowledge in our modest minds.

বিষ্ণু অবতার দত্তাত্রেয় ভগবান

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির অন্যতম তনয় ছিলেন ‘দত্ত’। দত্তের মাতা ছিলেন অনসূয়া দেবী। তিনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। মহর্ষি অত্রি পুত্র কামনা করিয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের উপাসনা করিলে পরে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান নারায়ণ দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি পুত্ররূপে তোমাকে দত্ত হইলাম।” সেইজন্য অত্রির পুত্র ‘দত্তাত্রেয়’ নামে খ্যাত হন। দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ছিলেন। তাঁহার মাতা অনসূয়া দেবী সতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

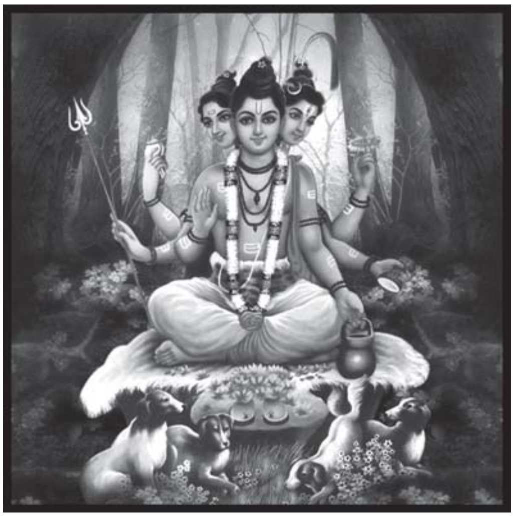

দত্তাত্রেয় ভগবান

অত্রির স্ত্রী অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার জন্যে একবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অত্রি-আশ্রমে আসিলেন। ত্রিদেব সাধু ব্রাহ্মণের বেশে ছিলেন। দেবী অনসূয়া যখন পাদ্য অর্ঘ্য এবং আচমনীয় লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা উহা স্বীকার করিলেন না এবং দাবী করিলেন যে অনসূয়া দেবী নিজ শিশুপুত্র সন্তানের মত তাঁহাদের সঙ্গে আচরণ করুন; ইহা সম্ভব হইলে তখন পাদ্য-অর্ঘ্য স্বীকার করা যাইবে। তপোতেজোময়ী সতী তখনই তাঁহাদের কপট বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি তখন তাঁহাদের গাত্রে নিজ স্বামীর পাদোদক ছিটাইয়া বলিলেন, “বাল ভব”। তৎক্ষণাৎ ত্রিদেব ছয় মাসের শিশুতে পরিণত হইলে তখন দেবী অনসূয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করান। অনসূয়ার এই অদ্ভুত অপূর্ব মহিমায় তখন ত্রিদেব মুগ্ধ হইয়া বর দিতে চাহিলে দেবী অনসূয়া ত্রিদেবকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার বর চান। ফলে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে দত্তাত্রেয়ের জন্ম হয়।

শৈশব হইতেই দত্তাত্রেয় তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন। যোগশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া দত্তাত্রেয়ের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তাঁহার তপোতীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। দত্তাত্রেয় বহু মুনি, ঋষি, সুর ও অসুরকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছিলেন সহস্রার্জুন, অলর্ক, প্রহ্লাদ, ভার্গব, পরশুরাম, যদু ও হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্যার্জুন। কার্তবীর্য্যার্জুন দত্তাত্রেয় ঋষির কল্যাণে চারিটি বিশেষ বরলাভ করেন। এই বরদানের প্রভাবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র বাহুধারীরূপ এবং অন্য সময় দ্বিবাহু হওয়ার ক্ষমতা পান, একই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী জয়ের শক্তিলাভ করিবারও বর পান। তাঁহার তৃতীয় বরটি ছিল ধর্মরাজ্য স্থাপন ও প্রতিপালনের বর। ইহা ভিন্ন তিনি উদ্ধত না হওয়ার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয়ের বরদানে কার্তবীর্য্যার্জুন পৃথু, নহুষ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের সমতুল্য বলিয়া মহাভারতের বনপর্বে কথিত হইয়াছেন। নৃপতি নহুষ দত্তাত্রেয়ের কৃপায় জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণু দত্তাত্রেয় অবতারে যজ্ঞ ক্রিয়ার সহিত বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন। মহর্ষি দত্তাত্রেয় ‘অবধূত গীতা’ প্রণয়ন করেন। ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার হওয়ায় তিনি জন্ম হইতেই সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সত্তার ভিতর সৎগুণের গ্রাহ্য শক্তি এতই তীব্র ছিল যে সৃষ্টির অণুতে-পরমাণুতে তিনি কোন না কোন শুদ্ধগুণ খুঁজিয়া লইতেন।

দত্তাত্রেয়ের মধ্যে গুরু বিনাই জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়াছিল। দত্তাত্রেয় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার আত্মচেতনার অনুভব হইয়া গিয়াছে, তিনি নিজেই নিজের গুরু হইয়া যান। ভগবৎসত্তার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব, অন্যের নহে। ভগবৎ সত্তায় আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে অন্য গুরুর আবশ্যক হয় না। পরমব্রহ্মের প্রতিভূ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। মহর্ষি অত্রির তিন পুত্রের মধ্যে দত্তাত্রেয় বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান আর বৈরাগ্য সম্পন্ন ছিলেন। যখন বড় হইলেন তখন অন্তরের পরা-বৈরাগ্যের কারণে তিনি কখনো বনে জঙ্গলে, কখনও পর্বতে পর্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কখনও শূন্য দেবালয়ে গিয়া তিনি ধ্যানাবস্থিত থাকিতেন। একদিন দত্তাত্রেয় আপন মনে আপন ভাবে মগ্নানন্দে বিভোর হাতীর মত চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে এইরূপ বিভোর এবং পরমানন্দে লীন দেখিয়া একজন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনি এমন কোন বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন যে যার কারণে আপনি এতই বিভোর এবং আনন্দমগ্ন থাকেন?" (অর্থাৎ, এমন আনন্দ আপনি কোন গুরুর কাছে প্রাপ্ত হইলেন?) রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান দত্তাত্রেয় বলিলেন, -"সর্বজনের গুরু তো নিজের আত্মাই হয়, কারণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান স্বরূপ নিজ আত্মজ্ঞান হইতেই সর্বজন কল্যাণ প্রাপ্ত হন।" দত্তাত্রেয় আবার বলিলেন, "হে রাজন্! আমি কোনো একজন মনুষ্যকে গুরু করিনি, আমি কাহারও নিকট হইতে কানে ফুঁক দেওয়া মন্ত্রও লই নাই কিন্তু যাহার যাহার মধ্যে যে যে সদ্‌গুণ আমার বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির নজরে পড়িয়াছে, সেই সেই গুণকেই আমি আমার স্বভাবে ধারণ করিয়া লইয়াছি, এই কারণে উহারা সকলেই আমার গুরু। এই প্রকারে আমার ২৪ জন গুরু আছেন।" তখন রাজা বলিলেন -"যে ২৪ জন হইতে আপনি যে যে গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের নাম আপনি আমায় বলুন তথা উহাদের থেকে আপনি কি কি গুণ গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত বলুন যাহাতে আমারও সম্যক জ্ঞানলাভ হয়।" দত্তাত্রেয় তখন রাজাকে জিজ্ঞাসু জানিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ করো। প্রথমে আমি সেই ২৪ জন গুরুবরের নাম তোমায় বলিব এবং তৎপরে উহাদের গুণ বিষয়ে বর্ণনা করিব। আমার ২৪ জন গুরু হইলেন - (১) পৃথ্বী (২) জল (৩) অগ্নি (৪) বায়ু (৫) আকাশ (৬) চন্দ্রমা (৭) সূর্য (৮) কপোত (৯) অজগর (১০) সিন্ধু (১১) পতঙ্গ (১২) ভ্রমর (১৩) মধুমক্ষী (১৪) গজ (১৫) মৃগ (১৬) মীন (১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরর পক্ষী (ক্রৌঞ্চ) (১৯) বালক (২০) কুমারী (২১) সর্প (২২) শরকৃৎ (২৩) মাকড়সা (২৪) ভৃঙ্গী (স্ত্রী ভ্রমর)।

ঐ ২৪ গুরু হইতে যে এক-একটি গুণ আমি গ্রহণ করিয়াছি সেই গুণগুলি এই প্রকার : (১) পৃথ্বী - দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন যে ক্ষমা এবং পরোপকার এই দুটি গুণ তিনি পৃথ্বী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২) জল - জল হইতে স্বচ্ছতা এবং মাধুর্য্য স্বভাব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩) অগ্নি - মানুষের যাহার যতটা ক্ষমতা ততটাই গ্রহণ করিতে হয় যেমন অগ্নির আপন উদরই পাত্র; সেই পাত্রে তাঁহার যতটা ক্ষমতা, ততটাই তিনি সঞ্চয় করেন। তাহার অধিক সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। (৪) বায়ু - যেমন বায়ু নিরন্তর চলাচল করেন কিন্তু কোন পদার্থেই আসক্ত হন না। সেই প্রকার মানুষেরও করা উচিত। অধিক ভোগেচ্ছা করিতে হয় না। (৫) আকাশ - যেমন আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ, বায়ু, বাদলাদি থাকে, কিন্তু আকাশের ঐ সকল কোন বস্তুর সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে না, আকাশ সদাই অসঙ্গই রহেন। আকাশ ব্যাপক এবং অসঙ্গ, যেমন সত্তায় আত্মা অসঙ্গ এবং ব্যাপক। দেহের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই এবং সংসারে থাকিয়াও আত্মা কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না। এই কারণে দত্তাত্রেয় ঋষি তাঁহাদের গুরু মানিয়াছেন। (৬) চন্দ্রমা - দত্তাত্রেয় রাজাকে বলিলেন, যেমন চন্দ্রমা সর্বকালে একরস রহেন, ছোট বা বড় হন না, তিনি পূর্ণই থাকেন কিন্তু পৃথ্বীর ছায়া পড়িলে তাঁহার হ্রাস ও বৃদ্ধি জানা যায়। কিন্তু তাঁহার স্বরূপের কখনও হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না, ঠিক তেমনই আত্মাও পূর্ণ রহেন। আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি চন্দ্রমার মত সর্বকালে একরস। (৭) দত্তাত্রেয়র সপ্তম গুরু সূর্য্য। যেমন সূর্য্য তাঁহার কিরণের দ্বারা পৃথিবীর তলদেশ হইতে জলকে টানিয়া আবার সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেন, সেই প্রকার বিদ্বান পুরুষেরও নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া আবার ত্যাগ করিতে হইবে। (৮) কপোত - দত্তাত্রেয়র অষ্টম গুরু কপোত। স্নেহ মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়, সেই কারণে মানুষের স্নেহকে ত্যাগ করিতে হইবে। একবার দত্তাত্রেয় দেখিয়াছিলেন, বনের মধ্যে এক বৃক্ষের উপর একটি কপোত এবং কপোতিনী থাকিত। সেই বৃক্ষতেই বাসা বাঁধিয়া ক্রমে উহারা সন্তান উৎপন্ন করিল। যখন সেই কপোত শিশুরা বড় হইল তখন উহারা বৃক্ষের নিম্নভাগে নামিয়া খেলিতে লাগিল। একদিন সেখানে একজন ব্যাধ আসিলে কপোত শিশুদের দেখিতে পাইল এবং জাল বিছাইয়া উহাদের ধরিয়া ফেলিল। ইহা দর্শনে তখন কপোতিনী ভাবিল 'যাহার সন্তান সন্ততির মৃত্যু হয় তাহার মরণই ভাল।' ইহা ভাবিয়া কপোতিনী সেই জালের মধ্যে স্বেচ্ছায় পড়িয়া গেল এবং ব্যাধ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ইহা দর্শনে স্নেহবশে তখন কপোতও কপোতিনীর গতি লাভ করিল। স্নেহের বশেই ব্যাধের হস্তে সকলের মৃত্যু হইল।" এই কাহিনী বিবৃত করিয়া দত্তাত্রেয় রাজাকে বলিলেন,"মানুষের জন্ম আর মরণের কারণই হইল স্নেহ। সেই কারণে বীতরাগী মানুষের স্নেহকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই মোক্ষের সাধন।" (৯) অজগর - যেমন অজগর একস্থানে একই ভাবে পড়িয়া থাকে এবং

নিজের ভোজনের জন্যেও যত্নবান হয় না, যা কিছু দৈবযোগে পাওয়া যায় তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার অধিকও কখনো ইচ্ছা করে না, সংগ্রহও করে না সেই প্রকার সন্ন্যাসীরও ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যা কিছু প্রাপ্তি হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। (১০) সিন্ধু - যেমন সমুদ্রে অনেক নদ নদীর জল আসিয়া সম্মিলিত হইলেও সমুদ্র চলায়মান হন না, সিন্ধু কখনোই আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, সেই প্রকার সন্ন্যাসীর মনও অনেক ভোগ্য বিষয় সম্মুখে দেখিয়াও চঞ্চল হয় না। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি সর্বদা আপন মর্য্যাদায় অটল রহেন। সিন্ধুর এই মহান গুণ দত্তাত্রেয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর দত্তাত্রেয় রাজাকে বলিলেন, "হে রাজন্! (১১) পতঙ্গ, (১২) ভ্রমর, (১৩) মধুমক্ষী, (১৪) গজ, (১৫) মৃগ এবং (১৬) মীন ইহারা সকলেই ইন্দ্রিয়জ গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেই কারণে মানুষের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত না হইয়া ঐগুলির প্রতি বৈরাগ্য ধারণ করিয়া আপন দুর্গতি হইতে ত্রাণলাভ করিতে হইবে। যেমন পতঙ্গ দীপকে মোহিত হইয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তেমন পুরুষ মানুষ যদি স্ত্রীর রূপে মোহিত হয় এবং আকর্ষিত হয় তবে তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যেমন ভ্রমর কমলের গন্ধে প্রভাবিত হইয়া কমল মধ্যে আটকাইয়া যায়, তেমন বাসনার কারণে মানুষ স্বয়ংই সংসারে লিপ্ত রয় যার ফলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। যেমন মধুমক্ষী বহু শ্রমে নিজ ঘর নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে তাহার লাভ উঠাইতে পারে না, অন্যে সেই লাভ উঠায় এবং মধু সংগ্রহই তাহার জীবনে মৃত্যুর কারণ হয়। তেমনি সন্ন্যাসীরও সংগ্রহের বৃত্তি হইতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।" এই প্রকার জীবগণের স্বভাবের উদাহরণ দিয়া দত্তাত্রেয় ভগবান রাজাকে মোক্ষলাভের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এইবার দত্তাত্রেয় তাঁহার (১৭) তম গুরু পিঙ্গলার কথা রাজাকে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "হে রাজন! নিরাশার গুণ আমি এক বেশ্যার নিকট শিখিয়াছি। এক নগরে পিঙ্গলা নামে একজন বেশ্যা থাকিত। সে তাহার গ্রাহকদের জন্যে শৃঙ্গার করিয়া জানালায় বসিয়া বাদর দেখিত। একদিন তাহার নিকট কোন গ্রাহক না আসিলে সে অশান্ত হৃদয়ে নিরাশ হইয়া নিজ কর্মকে ঘৃণা করিতে লাগিল। ঠিক এই প্রকার সংসারী মানুষ তাহার ঈপ্সিত ভোগ্য সামগ্রী প্রাপ্ত না হইলে নিরাশ হইয়া 'ভোগে সুখ হয় না' এই বোধ করিয়া আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলে তখন সাচ্চা সুখের সন্ধান পায়। (১৮) কুরর পক্ষী - ইহার নিকট দত্তাত্রেয় ভোগ ত্যাগ হইতে সুখ প্রাপ্তির শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৯) বালক - দুধ খাইয়া বালক যেমন চিন্তারহিত হইয়া যেই প্রকার ঘুমাইয়া পড়ে, ঠিক তেমনই ভিক্ষান্নতে যাহা কিছু প্রাপ্তি হয়, তাহা ভোজনান্তে সর্বপ্রকার চিন্তা মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী ঘুমাইয়া পড়ে। চিন্তা রহিত থাকিবার গুণ দত্তাত্রেয় বালকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২০) কুমারী - একেলা নিঃসঙ্গ থাকিবার গুণ দত্তাত্রেয় এক কুমারী কন্যার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ধ্যান সিদ্ধ হইতে হইলে সন্ন্যাসীদের সর্বদা একলা অবস্থান করা উচিত। (২১) সর্প - যেমন সর্প নিজের গৃহ তৈরী করে না, প্রকৃতিজ ঘরেই নিবাস করিয়া থাকে, সেই প্রকার সন্ন্যাসীদেরও নিজ আলয় তৈরী করা উচিত নয় যাহাতে ঘরের প্রতি তাহার মোহ না জন্মায়। উহারা নির্মিত মন্দিরে, দেবদেউলে এবং গুফাতেই নিবাস করিয়া থাকে।

(২২) শরকৃৎ - মন একাগ্র কবির গুণ দত্তাত্রেয় একজন শরকৃৎ অর্থাৎ বাণ নির্মাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাণকে সিধা করিয়া নির্মাণ করিতে এবং লক্ষ্যভেদ করিতে যে একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, সেই রকম একাগ্রতাই প্রত্যেক যোগীর হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মবিদ্যা সাধন কালে ধ্যান যোগে একাগ্রতা অবলম্বন করিতে হয় যোগীকে। (২৩) মাকড়সা - যেমন মাকড়সা নিজ লালা নির্গত করিয়া জাল বুনিয়া সেই জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনই মানুষ নিজ সংকল্প বিকল্পে স্বয়ং এই জগতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।" সংকল্প বিকল্প ত্যাগের গুণ দত্তাত্রেয় মাকড়সার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২৪) ভৃঙ্গী - দত্তাত্রেয় রাজাকে বলিলেন, তাঁহার ২৪ তম গুরু এক ভৃঙ্গী। ভৃঙ্গী এমন এক জীব যে, যে কোন কীটকে ধরিয়া নিজের বাড়ীর ভিতর রাখিতে সক্ষম এবং ওটিকে সম্মুখে রাখিয়া শব্দ করিতে থাকে। সেই কীট বারংবার সেই ভৃঙ্গীর শব্দ শুনিতে শুনিতে ভৃঙ্গীরূপ হইয়া যায়। এই প্রকার মনুষ্যও বার বার শরীরের চিন্তন করিতে করিতে নিজ শরীর বিষয়টি বুঝিতে পারে, কিন্তু যখন তাহার হুঁশ হয় যে সে শরীর নয়, সে আত্মা, তখন সে সেই দেহের মোহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপে স্থিত হয়।

ইহার পর দত্তাত্রেয় ভগবান রাজাকে বলিলেন — "ঐ ২৪ জন গুরুগণ আমাকে পরমার্থের বোধ প্রদান করিয়াছেন যাহা হইতে আমি নিজ স্বরূপ আত্মায় স্থিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছি। এখন আমি পরমানন্দে স্থিত আছি। অতএব

আমি সমস্ত চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি।” ভগবান দত্তাত্রেয়র জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই রাজাও সংসার মোহ ত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দত্তাত্রেয়র মত জীবন্মুক্ত মহাজ্ঞানীর যেখানে চরণ পড়িয়াছে, সেই স্থানই পবিত্র তীর্থ হইয়া গিয়াছে। দত্তাত্রেয় পরিভ্রমণেই অধিক জীবনকাল কাটাইয়াছেন। তিনি যেখানে চতুর্মাস্য করিতেন সেই স্থলই তীর্থ হইয়া গিয়াছে। গির্ণার পর্বত, নাসিক হইতে কিছুদূরে গোদাবরী তটে, আরাবল্লী পর্বতে, নর্মদা তীরে, শ্রীনগর হইতে কিছু দূরের পর্বতে, হিমালয় ইত্যাদি বহু স্থানে দত্তাত্রেয় ভগবানের তপোস্থলী আজ মহান তীর্থরূপে পরিগণিত।

দত্তাত্রেয় ভগবানের ‘অবধূত গীতা’ অদ্বৈত দর্শনের এক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। অবধূত গীতায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’-এর অনুভূতি একমাত্র আত্মজ্ঞানীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব। আত্মার অস্তিত্বই সর্বস্ব এবং সর্বব্যাপক। একমাত্র আত্মারই সত্তা বিদ্যমান, ইহা ভিন্ন আর কোন সত্তা নাই। এই কারণে যত দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায় সব আত্মার অজ্ঞানতার কারণে প্রতীত হয়। এগুলি সব মনের কারণ যেগুলি হল ভ্রান্তিমাত্র। দত্তাত্রেয় জীবন্মুক্ত জ্ঞানীকে ‘অবধূত’ বলিয়াছেন। ‘অবধূত’ শব্দ চারটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। অ + ব + ধূ + ত = অবধূত; এক্ষেত্রে ‘অ’ অক্ষরে ‘আশা রূপী পাশ হইতে মুক্ত অবস্থা’, ‘আদি মধ্য এবং অন্ত যাঁহার নির্মল’, ‘আনন্দ’তে নিত্য মগ্ন যিনি, এই অ-কার হইল অবধূতের লক্ষণ। ‘ব’ অক্ষরে ‘যিনি বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন’ এবং ‘বক্তব্য’ যাঁহার রাগরহিত, যিনি সর্বদা ‘বর্তমান’ অবস্থায় রহেন, সেই ব-কার অবধূতের লক্ষণ। অবধূত শব্দে ‘ধূ’ অক্ষরে ঋষি দত্তাত্রেয় এই অর্থ করিয়াছেন যে ‘ধূলি ধূসর যাহার অঙ্গ’, অর্থাৎ, যিনি বিলাসিতা এবং শৃঙ্গার রহিত, ‘ধৌত চিত্ত যাহার’ অর্থাৎ নির্মল চিত্ত সম্পন্ন যিনি এবং ‘ধারণা এবং ধ্যান’ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন যিনি, এই তিন ‘ধূ-কার’ অবধূতের লক্ষণ হয়। অবধূত শব্দে ‘ত’কার-এর অর্থ হইল, ‘যিনি তত্ত্ব চিন্তাকে ধারণ করিতে সক্ষম’, যিনি চিন্তা এবং চেষ্টা হইতে রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ‘তমরূপী অহংকার’ হইতে যিনি রহিত হইয়াছেন, এই তিন ‘ত-কার’ অবধূতের লক্ষণ বলিয়া কথিত।

‘অঘোর’ পশুপতি মহাদেব রুদ্রের শরীর। যজুর্বেদ, অথর্ব বেদ, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতেই শিবের মঙ্গলময় অঘোর মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। অঘোর পন্থযোগ-এর ধারায় ঔঘড়, অঘোর তথা অবধূত, এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে। অঘোর বা অবধূত ঔঘড়ের পরম্পরা অতি প্রাচীন। অঘোর যোগসিদ্ধ মহাত্মা বাবা গুলাবচন্দ আনন্দ অঘোর পন্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন —‘অঘোর বা অবধূত মত কোন নবীন মত নয়। শিবজী মহারাজের পঞ্চমুখের একটি মুখকে অঘোর বলা হয়। ইহা লিঙ্গ পুরাণে সিদ্ধ হইয়াছে। উপনিষদ্‌, রুদ্রী এবং শিবগায়ত্রী হইতে ইহার মহত্ত্ব প্রকট হইয়াছে। জগদ্‌গুরু দত্তাত্রেয় ভগবানও এই মতের প্রচার করিয়াছেন।’ পুরাণে কথিত আছে যে প্রভু দত্তাত্রেয় বহু হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীকে অষ্টাঙ্গ যোগ-জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। পতঞ্জলিদেব সেই অষ্টাঙ্গ যোগজ্ঞান সূত্রাকারে গ্রথিত করেন। *(সহায়ক গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, কূর্মপুরাণ, জাবালদর্শন উপনিষদ্‌)*

পূর্ণতার প্রকাশ

অহং যখন অগ্রাহ্য হয়ে অব্যক্তভাবে রয়, মহাপ্রতিভা প্রভার মতো সত্তায় স্ফুরিত হয়।
তবে, প্রকটে প্রতিভা মহা মহাভাবের মত, ব্যক্তি সত্তাকে করি অদ্ভুত আশ্চর্য্যান্বিত!
অহং রয় স্বভাবে গৌণাকারে স্থিত, মুখ্য শুধু সৃষ্টি চিন্তন ভরা অস্তিত্ব।।
তখনই যে হয় পূর্ণ পরিপূর্ণত্বের প্রকাশ, পূর্ণাকারে সত্তা রহে নির্বিকার ও স্বকাশ।।

—সত্তার স্বভাবে অহং-এর প্রকাশ যখন নির্লিপ্ত, নিষ্প্রভ, নিষ্কামতায় ভরিয়া ওঠে তখনই সত্তা বিশুদ্ধাকারে প্রতিভাত হয় এবং তখনই বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব মাঝে ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণাকারে প্রকাশ হয়। ঐ অবস্থায় সেই সত্তাও ঈশ্বরেরই প্রতিভূরূপে পরিগণিত হন। এই হইল মহাসত্তার মহাভাব। অবতারগণের ক্ষেত্রেই এইরূপভাব পরিলক্ষণীয়।

—শ্রীশ্রীমা রচিত ‘সৃজা’ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৯। (পত্র নং ১০) —(প্রথম ভাগ) কৃপাহীন বা কৃপাশূন্য যোগই যথার্থ গুরুর কর্ম .... । ইহার উদ্দেশ্য — কালের গতি রোধ করা ও সংসারের বা সর্ব-দুঃখের মূল উৎপাটন করা। ব্যক্তিগতভাবে মুক্তি, দুঃখ নিবৃত্তি, শান্তি, নির্বাণ, ঐশ্বর্য্য, পরমানন্দ প্রভৃতি প্রাপ্তির উপায় ছিল এবং এখনও আছে। কৃপাশূন্য যোগী ভিন্ন এই অখণ্ড দুঃখ মোচনের সামর্থ্য আর কাহারো নাই। —(এই বিষয়ে শ্রীমার বক্তব্য)

উত্তর — (পত্র ১০-এর প্রথম ভাগ) — সর্বপ্রথম জানিতে এবং বুঝিতে হইবে যে 'কৃপাহীন বা কৃপাশূন্য যোগ' কি? —'কৃপা' কথাটির অর্থ কর্ম করিয়া পাওয়া; অর্থাৎ, কর্ম দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই 'কৃপা' বলে। সদ্গুরু প্রদত্ত চিন্ময় বীজ দীক্ষাকালে আধারে বপন না হওয়া পর্য্যন্ত জীবচেতনা-সম্পন্ন সাধকের আধ্যাত্মিক চেতনার অগ্রগতি হওয়া সম্ভব হয় না। অতএব দীক্ষাকালে সদ্গুরুর অনুগ্রহ প্রত্যেক সাধকেরই বাঞ্ছনীয়। এই সদ্গুরুর অনুগ্রহ একপ্রকার 'দৈবকৃপা' বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু সদ্গুরুর দীক্ষা বা ঈক্ষণরূপী অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও অধ্যাত্ম পথে উন্নতি সাধন অসম্ভব। মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন — ''গুরু বিনা কৌন বতাবৈ বাট''- অর্থাৎ, সদ্গুরু বিনা অন্য কেহই সত্যপথের সন্ধান বলিতে পারেন না। সদ্গুরুর নিকট দিব্যশক্তিকণারূপী ব্রহ্মবীজ মন্ত্র ও তৎ প্রণব মন্ত্রের সাধন কৌশলরূপী ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া শিষ্য যখন কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন এবং নিজ পুরুষকার বলে সেই সাধন সোপানকে আপন আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসে তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের পর্য্যায়গুলি সাধন করিয়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হন, তখন সে অবস্থায় তপস্বী সাধক আত্মযোগযুক্ত হইয়া 'যোগী' হইয়া যান। ইহাকেই 'কৃপাহীন বা কৃপাশূন্য যোগ' বলে।

এই যোগের পর্য্যায়ে ব্যষ্টিগতভাবে আত্মকর্মের দ্বারা কৃপাশূন্য সাধকযোগী প্রাণায়াম ও মন্ত্রজপ সাধন বলে কালের গতি রোধ করিতে সক্ষম হন, অবিচ্ছিন্ন কালের জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং প্রাণায়ামের সহায়তায় দেহাভ্যন্তরস্থ চঞ্চল প্রাণকে স্থির অবস্থায় উপনীত করিতে সক্ষম হন। প্রাণকে হৃদয়ে একবার উপনীত করিতে পারিলে তখন কূটস্থব্রহ্ম-রূপী গগনগুহা তখন চন্দ্র এবং সূর্য্যের জ্যোতির ছটায় আপ্লুত হইতে থাকে। এখন যোগীর সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ অবস্থা। এ অবস্থায় বিভিন্ন পর্য্যায়ে যোগী-দেহের চেতনার গ্রন্থিগুলি ভেদন হয় এবং বিভিন্ন পর্য্যায়ের স্বাধ্যায়ের সোপান সমাপ্ত হইলে পরে তখন ঈশ্বর-প্রণিধানের পর্য্যায়ে ধ্যানের গভীরে আত্মজ্যোতিতে একবার যোগীর সত্তা লয়প্রাপ্ত হইলে পরে, সমাধি হইতে বুত্থিত অবস্থায় তখন সব দুঃখের মূল উৎপাটিত হইয়া যায়। কৃপাশূন্য যোগী সদ্গুরু ভরসায়, পরম বিশ্বাসে উপনীত হইয়া নিরলস চেষ্টার দ্বারা ঐ প্রকার আত্মদর্শন এবং আত্মউপলব্ধির পর্য্যায়ে পৌঁছাইতে সক্ষম হন।

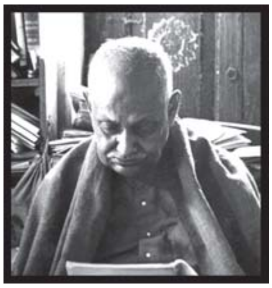

কৃপাহীন যোগী বহু বহু জন্মান্তরের শুভ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কোন এক জন্মে 'আত্মজ্ঞানী' হন। আত্মজ্ঞ যোগীই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কথিত। সর্বদা যিনি আত্মায় যোগযুক্ত থাকেন তাঁর আধারের মধ্যে অনন্ত বিভূতির প্রকাশ ঘটে। এই বিভূতিগুলিই পরবর্তীতে যৌগৈশ্বর্য্য রূপে আধারের পরমাশ্চর্য্য গুণ হইয়া দাঁড়ায়, যোগী শিবত্বলাভ পূর্বক পরমানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে বিভোর রহেন। যখন কেহ এই ব্রহ্ম-অবস্থায় পৌঁছান তখন সিদ্ধমণ্ডল হইতে জীব ও জগৎকল্যাণের জন্য তাঁহাদেরকে বারংবার অনুরোধ করা হয় যে জগৎগুরু বা সদ্গুরুরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া যেন তাঁহারা জীবগোষ্ঠীকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন। এই পর্য্যায়ে কৃপাহীন যোগসিদ্ধ যোগীর করুণা বিভূতির উন্মেষ হয় সত্তায়; তখন তিনি সদ্গুরুরূপে জীব ও জগৎকে সেই করুণা বিভূতি দ্বারা সিক্ত করিতে আসেন এই পৃথ্বীমণ্ডলে।

কৃপাশূন্য যোগী যোগের সর্ব পর্য্যায়গুলি প্রত্যক্ষভাবে, বিশদভাবে, তত্ত্বগতভাবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অবগত হন বলিয়া তিনি সকল পর্য্যায়ের চিরস্থায়ী জ্ঞানলাভ করিয়া

থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাই বলিতেন — সদ্‌গুরুগণ উপর হইতেই চাপরাশ লইয়া আসেন। এ জগতে তাঁদের নিজ আধারের জন্য কোন সাধনা করিতে হয় না, অন্যের সদ্‌গতির জন্যই তাঁহাদের জগতে আগমন। সদ্‌গুরুরূপী কৃপাহীন যোগী ভিন্ন জীবের অখণ্ড দুঃখ (জন্মজন্মান্তর সম্পর্কিত দুঃখ) মোচনের সামর্থ্য আর কাহারো নাই। কারণ সদ্‌গুরু হলেন 'ভগবান' বা 'সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিভূ', ব্রহ্মবেত্তা বা ভগবৎসত্তা।

অন্যদিকে সমষ্টিগতভাবে বলা যায় যে পৃথিবীর দুঃখভার-মোচন অবস্থা কোনদিন ছিল না এবং ভবিষ্যকালেও সম্ভব নয়। আচার্য্য গৌড়পাদের মতে -'সৃষ্টি বা জগৎ সংসার অনাদি-অনন্ত'; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুক্তি, দুঃখ-নিবৃত্তি (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে যাতায়াত নিবৃত্তি) হওয়া সম্ভব, যাহা তপঃ সাপেক্ষ। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সৃষ্টিধারা নিত্য, অনাদি-অনন্ত হওয়ায় সমষ্টিগত মুক্তি, দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব নয়। ইহাই দিব্য পরিচালিত সৃষ্টির নিয়ম। ডাঃ গোপীনাথজীর 'বিশুদ্ধবাণী' নামক পুস্তকে শ্রীশ্রীনবমুণ্ডি মহাসন অধ্যায়ে আছে — ''অক্ষর পুরুষ কূটস্থ বা সাক্ষীচৈতন্য ইনি সকলের দ্রষ্টা - ইঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, ইনি সকলের আত্মস্বরূপ। ইঁহাকে দর্শনের নামই আত্মদর্শন। কিন্তু স্বভাবের বিচিত্র লীলায় কূটস্থ-পুরুষ দ্রষ্টা হইয়াও এখন আত্মবিস্মৃত। ইনি সবই দেখেন, কেবল নিজেকে দেখেন না, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই ইঁহার দৃষ্টিসম্ভূতা। কিন্তু এই দৃষ্টি নিদ্রাবিষ্ট দৃষ্টি এবং দৃশ্য স্বাপ্নিক দৃশ্য। ইনি যখন নিদ্রা হইতে জাগিবেন তখন স্বপ্ন থাকিবে না এবং স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যও থাকিবে না। তখন স্বভাবতঃ সকলেরই আত্মদর্শন হইবে। প্রণব-পুরুষ (কারণ-সলিলে শায়িত যে নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু) রূপে ইনিই তো বহু হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাই ইনি স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইলে বহুরও আত্মদর্শন ও স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইবে।'' — প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি অসম্ভব সম্ভাবনা কারণ কোন ক্ষণে ভগবৎ ইচ্ছা হইবে এবং অক্ষর-পুরুষ জাগ্রত হইবেন, প্রণব-পুরুষ স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইবেন, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব ইহা কৃপাশূন্য যোগীরও অসাধ্য।

—*যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৮)

গুরুদীক্ষা —

''সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ
তব কয়লা কি ময়লা ছুটে যব, আগ করে প্রবেশ''।।

এমনিভাবে ভূতনাথবাবুর আলয়ে মাণিকলালের প্রায় বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হইল। একদা ভূতনাথবাবুর গৃহসংলগ্ন উদ্যানের আশ্রমে সিদ্ধপুরুষ 'গন্ধবাবা' অর্থাৎ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের শুভাগমন হইল। 'গন্ধবাবার' নিকট দীক্ষালাভের জন্য মাণিকলাল উদ্‌গ্রীব হইয়া সবিনয়ে অন্তরস্থ বাসনা নিবেদন করিলে গন্ধবাবা মাণিকলালকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে মাণিকলাল অতিশয় মর্ম্মাহত হন; তথাপি অতি নম্রভাবে বলিলেন যে, ''আমি জাতিতে সুবর্ণ বণিক, নীচ, সেই জন্যই হয়ত আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।'' গন্ধবাবা মাণিকলালের বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় সবিশেষ উপলব্ধি করিয়া সস্নেহে তাঁহাকে, ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, যে, ''আমি তোমায় দীক্ষা দিব না। তোমার দীক্ষার জন্য এক মহাপুরুষ নির্দিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি নির্দ্ধারিত দিনে ও ক্ষণে আবির্ভূত হইবেন।'' গন্ধবাবার এই উক্তিতে মাণিকলাল কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলেও সন্দেহের সুরে বলিলেন, ''হ্যাঁ, আপনাকে নিকটে পেয়েও পেলাম না, আর আমার জন্য ভবিষ্যতে আবার অন্য গুরুজী আসবেন?'' (গন্ধবাবা পুনরায় বলিলেন, ''যা-না বেটা, যা বল্লাম শোন না'') সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষের অমর বাণী অচিরেই মাণিকলালের জীবনে স্মরণীয় রূপ ধারণ করিল এবং তিনি আমাদের নিকট অত্যন্ত আবেগমুগ্ধ অবস্থায় যাহা প্রায়ই ব্যক্ত করিতেন, সেই সুমধুর উপাখ্যান অতঃপর বর্ণনা করিব।

গুরুদীক্ষার পূর্বেই মাণিকলাল বিশ্বজননীর সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রিকাল পর্যন্ত নিয়মিত সাধুসঙ্গ, বৈকালে কানু-জংশনের পশ্চিমদিকের শ্যামল প্রান্তরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ভূতনাথবাবুর আলয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথেয়তায় মাণিকলালের দিন পরম সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি মাণিকলাল আবাল্য নির্জনতা সমধিক পছন্দ করিতেন। প্রায় প্রত্যহই একা বৈকালে তিনি কানু জংশনের সংলগ্ন নির্জন মাঠে বেড়াইতেন এবং

গন্ধবাবার অমর বাণী অন্তরে ধারণ করিয়া অজানা এক মহাপুরুষের কৃপার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন।

এইরূপ এক বৈকালে নিকটস্থ এক বটবৃক্ষের পাদদেশে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী কিঞ্চিৎ শ্মশ্রু- গুম্ফসমন্বিত, মুখমণ্ডল, সৌম্য, শান্ত, সুকুমারকান্তি অথচ উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (বয়স অনুমান ১৯-২০) এক মহাপুরুষের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আহ্বানে মাণিকলাল আকৃষ্ট হইলেন। ''মাণিকলাল, তুমি এখানে এস, আমি তোমাকে ডেকেছি।'' সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি কিভাবে তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এই চিন্তা মুহূর্তের জন্য মাণিকলালকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কিন্তু অবিলম্বে সেই চিন্তার জাল ছিন্ন করিয়া তিনি সেই মহাপুরুষের নিকট বটবৃক্ষমূলে উপনীত হন। তিনি সমীপবর্তী হইলে মহাপুরুষ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, ''আমি তোমায় দীক্ষা দিতে আসিয়াছি; কল্য প্রাতে দীক্ষা দিব। স্নানান্তে একখানি নূতন আসন ও হরিতকী সঙ্গে করিয়া আনিবে, না হয় তাও দরকার নাই।'' এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর মন্ত্রমুগ্ধের মত মাণিকলাল তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলেন। প্রণামান্তে যখন উঠিলেন, তখন দেখিলেন যে দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত। যে দীক্ষা পাবার আশায় তিনি মনেপ্রাণে অধীর হইয়াছিলেন, ও একদা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন সেই দীক্ষার সময় যে আসন্ন তাহার মধুর চিন্তায় ও গন্ধবাবার ভবিষ্যৎ বাণী যে মুক্ত সম্ভাবনা লইয়া মাণিকলালের জীবনে সমাসন্ন, তাহার সুখকর অনুভূতিতে ভরপুর হইয়া তিনি ভূতনাথবাবুর আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্বিক ভূতনাথবাবুর কাছে পুলকিত অন্তরে নিবেদন করিলেন। সেই সুখবর সমাচারে ভূতনাথবাবুও অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হইয়া আগামী দিনের জন্য মাণিকলালের দীক্ষার নিমিত্ত অপরিহার্য্য উপকরণাদি সংগ্রহে তৎপর হইলেন।

ভাবীকালের সম্ভাবনার আনন্দঘন অনুভূতিতে শুভরাত্রি সত্বর অতিবাহিত হইল। প্রাতে স্নানান্তে নব চেলির বস্ত্র পরিধান করিয়া আসন ও হরিতকী হস্তে মাণিকলাল উদ্বেলিত অন্তরে মহাপুরুষ নির্দেশিত বটবৃক্ষমূলে একা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পূর্ব দিনের সেই সুচারুদর্শন দীপ্তিমান দৈবপুরুষ পূর্ব হইতেই তথায় উপস্থিত হইয়া আছেন। মাণিকলাল উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে সম্মুখে আসন পাতিয়া বসিবার নির্দেশ দিলেন। মাণিকলাল আসনে উপবেশন করিলে সেই মহাপুরুষ তাঁহার দৈব দক্ষিণ হস্তটি মাণিকলালের ব্রহ্ম তালুদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, ''এই আমি তোমায় দীক্ষা দিলাম।'' দীক্ষান্তে মাণিকলাল আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাপুরুষের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার আশ্রমে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি এই বলিয়া মাণিকলালকে বিরত করিলেন যে, ''সংসারে তোমায় থাকিতে হইবে, কাজ আছে, বিশ্বের ত্রিতাপ তাপিত নরনারী ঈশ্বরের সত্ত্বা ও অস্তিত্ব সন্ধানে তোমার নিকটে আসিবে, সময়ে তোমার কার্য্যক্রম উপলব্ধি হইবে। নিজ যোগ্যতার উপর সন্দিহান হইও না। দৈবের নিকট সবই সম্ভব।'' পরে মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিলেন যে, ''আমি আপনার নিবাস জানি না, আমার নিবাস সম্বন্ধেও আপনি অবগত নহেন — এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে কিভাবে আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিব?''

উহাতে সেই জ্যোতির্ময় দিব্য মহাপুরুষ বলিলেন যে, ''তোমার বাসস্থান আমার জানা আছে, আর আমার বাসস্থান তোমার পক্ষে জানা অসম্ভব। আমি আকাশ পথে আসিয়াছি। তুমি ডাকিলে আমি আসিব কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কদাচ ডাকিও না; বরং প্রয়োজন বোধে আমিই ভবিষ্যতে তোমায় দর্শন দিব।'' তিনি একথাও ব্যক্ত করিলেন যে, ''তুমি যে কানু জংশনে আসিয়াছ ও ভূতনাথবাবুর আলয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছ, সবই আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে।'' সংসারে বাস করার যন্ত্রণা ও বহুমুখী অসুবিধার বিষয় তাঁহার গুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে গুরু তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিলেন যে, ''সাংসারিক জীবনে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহা চিন্তা মাত্রই দশ হাতের ব্যবধানেই তাহা পাইবে। অনন্তর মাণিকলাল পুনরায় পূজ্যপাদ শ্রীগুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বিদায় ভিক্ষা জানাইতে গেলে দেখিলেন যে তাঁহার পরম আরাধ্য গুরুদেব পূর্ব দিনের মতই অন্তর্হিত হইয়াছেন। ক্ষণিকের জন্য মাণিকলাল গুরুদেবের বিদায় ব্যথায় বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই দৈব গুরুপ্রাপ্তির জন্য মহাসাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি ভূতনাথবাবুর আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষার সুমহান ঘটনা নিবেদন করিলেন ও অনির্বচনীয় আনন্দ ধারায় নিমগ্ন হইলেন। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের শিষ্য,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ — *(পূর্ব প্রকাশিতের পর....)*

বুদ্ধির যত প্রকার বৃত্তি আছে তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী ভেদে তিন প্রকার বৃত্তি আছে।

সাত্ত্বিকী বৃত্তি যথা — শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

রাজসিকী বৃত্তি যথা — কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি।

আর তামসিকী বৃত্তির কার্য্য আলস্য, প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ ইত্যাদি।

সত্ত্ব, রজো ও তমো এই ত্রিগুণ পরস্পর বিরোধী। রজো, তমোগুণকে পরাভব করিয়া সত্ত্বগুণ উদিত হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া রজোগুণ উদিত হয় এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভব করিয়া তমোগুণ উদিত হয়। পরস্পর বিরোধী থাকায় তুমি ঐ সকল বৃত্তি হইতে পার না। তুমি যেমন বাহ্য বস্তু সকলের জ্ঞাতা হইয়া তাহা হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ তোমার মন বুদ্ধির অভ্যন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তির উদয় হইতেছে, তুমি তাহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা এবং তৎ সমস্ত হইতে বিভিন্ন। যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উঠিলে সেই তরঙ্গ সমুদ্রের আকার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ মন, বুদ্ধি হইতে উত্থিতা বৃত্তি মন, বুদ্ধিরই আকার। এতৎ সমস্তই জড় ও ত্রিগুণাত্মক। তুমি তদতীত, যেহেতু তুমি চেতন হইয়া তাহাদের জ্ঞাতা। এই হেতু তুমি ত্রিগুণাতীত ও গুণের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। তোমার মন, বুদ্ধি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা নহে। তাহারা জড় হইয়া চেতনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। জীবের আত্মজ্ঞান আবৃত থাকায় অজ্ঞানবশতঃ মন বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জানে। মন, বুদ্ধিকে জ্ঞাতা বলিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়ত্ব থাকে না। শ্রুতি ঐ সকলকে ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'শক্তি বিপর্য্যয়াৎ' এই সূত্রে বেদান্ত-দর্শনে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মাই প্রসিদ্ধ দ্রষ্টা। ইহার অর্থ — পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা হইতে পারে না। শ্রুতি আরোও বলিয়াছেন - 'যেন সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' অর্থাৎ যাহা কিছু অনুভূত হয় তাহা পরমাত্মা দ্বারাই হয়, তাঁহাকে আর কাহার দ্বারা দেখিবে শ্রুতি তাঁহাকে 'মনোবাচামগোচরং, অবাঙ্‌মনসগোচরম্' এই সমস্ত বাক্য দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, 'যাতা বাচা নিব্বর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।' অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের অতীত। ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন — 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং।' তিনি বাক্য মন, বুদ্ধির অগোচরে হইলেও জ্ঞানগম্য। জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু সাধনের দ্বারা প্রকট হইলে জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে। সেই ব্রহ্মই সকল জীবের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত; যেমন সূর্য্য দেদীপ্যমান থাকিলেও তোমার চক্ষু আবৃত থাকিলে তুমি তাহাকে দর্শন করিতে অক্ষম হও। আবরণ উন্মোচন হইলে তখন দর্শন করিতে সক্ষম হও; সেইরূপ পরমাত্মা তাঁহার মায়া দ্বারা তোমাকে আবৃত রাখায় তোমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক হইলেও তুমি জ্ঞানৈশ্বর্য্যহীন হইয়াছ। বেদান্ত-দর্শনে সূত্র আছে — 'পরাভিধানত্তউ তিরোহিতং অতোহস্য বন্ধ বিপর্যয়ৌ।' ইহার অর্থ — পরমাত্মার সঙ্কল্পবলে জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়। পরে সূত্র করিয়াছেন - 'দেহ যোগাদ্ধা।' দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত হওয়ার পরেই জ্ঞান তিরোহিত হয়। এই উভয় বাক্যই সত্য।

সৃষ্টিকালে পরমাত্মা তাঁহার স্বরূপের একাংশে মায়া দ্বারা আবৃত করিয়া সেই অংশে তিনি স্বয়ং 'জীব ও জগৎ' রূপ ধারণ করেন। পরমাত্মার অবশিষ্ট অংশ অবিকৃতই থাকে। এই জন্য জীবকে পরমাত্মার অংশ বলে। জীব ও পরমাত্মার অংশাংশী সম্বন্ধ থাকা উক্ত হয়। ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে — 'বিষ্টব্যাহমিদং কৃৎস্ন একাংশেনস্থিতো জগৎ।' অর্থাৎ এই জগৎ তাঁহার একাংশে স্থিত। তিনি তাহা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আরোও বলিয়াছেন -'মামৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।' ইহার অর্থ, জীবভূতঃ শব্দের অর্থ —

জীব ছিল না, জীব হইল। ঈশ্বরের একাংশ লইয়াই জীবরূপত্ব। জীবের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ নিত্য ও স্বাভাবিক তাহা মায়ার আবরণ দ্বারা আবৃত। ভগবদ্‌গীতায় উক্তি আছে -'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। জ্ঞানেন হি তজজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবদ্-জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং।' ইহার অর্থ - অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হইলে আদিত্যবৎ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞানোদয়ে জীব আপনাকে অখণ্ড চৈতন্য বলিয়া অবগত হয়েন। অংশরূপে নহে। যখন আবরণ উন্মোচিত হয়, তখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ স্বভাব অভিব্যক্ত হয়। এই বিষয় মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে কয়েকটি সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তথায় জ্ঞানপ্রাপ্ত বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের বিষয় বলিয়াছেন। তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

ভগবদ্‌গীতায় উক্তি আছে -'আত্মাশুদ্ধ স্বয়ংপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। তথাপি জীব নির্লেপো মোহিতো মম মায়া। অহং সুখীচ দুঃখীচ ইত্যেবভিমন্যতে।' ইহার অর্থ - 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দই যাহার রূপ। শ্লোকের অর্থ এই পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত, স্বয়ংপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দরূপ, জীবও সেই প্রকার নির্লেপ স্বভাব হইয়াও আমার মায়া দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ অভিমানযুক্ত হয়।

ঘেরণ্ড সংহিতাতে জীবের স্বরূপ যে পরমাত্মা ইহাই উক্ত হইয়াছে। যথা —

'অহং দেবো ন চান্যেহস্তিম ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান।।'

পরমাত্মা জীবের নিকট অজ্ঞানবশতঃ অপ্রকাশ থাকিলেও সাধন দ্বারা প্রকট হয়েন। ইহা নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা বেদান্ত দর্শনে প্রকাশিত আছে। যথা —

'প্রকাশাদি বচ্চা বৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।'

অন্য সূত্রে — *'অপি সংরাধনে পুংস্তাদিবৎ বাল্যে'* — এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন — যেমন বাল্যকালে কাম অপ্রকট ভাবে থাকিয়া পরে যৌবনকালে প্রকট হয় — তদ্রূপ জ্ঞান দেহমধ্যে অপ্রকটভাবে থাকিয়া পরে প্রকট ও প্রকাশমান হয়। ছিল না, পরে আসিল এরূপ নহে। অপ্রকট ভাবে ছিল, পরে প্রকট হইল। ইহাই তাৎপর্যার্থ। *...ক্রমশঃ*

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৫৮)

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে :—

বাপিদা গুরু মহারাজের অর্থাৎ শ্রীশ্রীসরোজ লাহিড়ী বাবার একজন সুদক্ষ ক্রিয়াবান সন্তান। এই বাপিদা প্রতিদিন মধ্যরাত্রে যখন যোগের অবস্থায় থাকেন, তখন সে অবস্থায় কূটস্থে দর্শনের মাধ্যমে তাঁর নিকট অনেক সত্য প্রকাশিত হয়। ইং ২০১৬-র জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখে এরকম একটি মহাদর্শনের কথা ও ভাব বাপিদার কথাতেই প্রকাশ করলাম—

"সম্ভবতঃ তখন রাত ৩টা হবে। আমি গুরুভাবে (শ্রীগুরু চিন্তায় মগ্ন অবস্থায়) ক্রিয়াযোগে অবস্থান করছি, তখন আমি দর্শনে স্পষ্ট দেখলাম, আমি অখণ্ড মহাপীঠে কোনো এক অনুষ্ঠানে গেছি; হলের মধ্যে মায়ের ভক্ত এবং শিষ্যের সমাগম। আমাকে আশ্রমের মা 'গুরু' সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। আমি গুরুর কথা বলতে গিয়ে বললাম, 'দেখুন এখানে মায়ের ভক্ত এবং শিষ্যবৃন্দ যারা আছেন বিভিন্ন বয়সের তাঁদের প্রথমেই আমি বলতে চাই যে অনেক জন্মের সুকৃতির ফলে এরকম 'আদ্যাশক্তি মা' পেয়েছেন; যে মহাশক্তি মা-কে পেতে গেলে মুনি ঋষিদের তপস্যা করতে হয়; সেই মাকে আপনারা পেয়ে গেছেন। এই মাকে শুধু ভক্তি বা শ্রদ্ধা করলেই হবে না, মাকে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে মনে করতে হবে

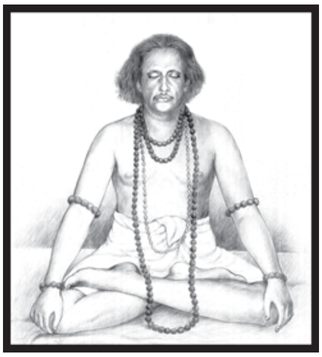

মাকে নরম তুলোর মধ্যে রেখেছেন এমনভাবে যে মায়ের দেহের কোন অংশে কোনরূপ আঘাত না লাগে; কোনো মুহূর্তের জন্যে মা যদি সামনের দিকে টাল খেয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পিঠ দিয়ে মাকে guard করবেন। আপনারা

আর একটা কথা ভালোভাবে জেনে রাখুন যে বলা হয় গর্ভধারিণী মা সবচেয়ে বড় এবং তারপর গুরুমা — কথাটা অত্যন্ত সত্যি, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখবেন যে গর্ভধারিণী মা কেবল নিজের সন্তানের জন্যে। কেবলই নিজের সন্তান ছাড়া আর কিছু বোঝে না, কিন্তু গুরুমা সবাইয়ের মধ্যে, সবাই তাঁর সন্তান। সেইসব সন্তানের ব্যথায় নিজের গর্ভধারিণী মায়ের মতনই সূক্ষ্মদেহে সর্বদাই সন্তানের কাছে উপস্থিত থাকেন। — আর একটা শেষ কথা বলে যাই যে এই গুরুমাকে (শ্রীশ্রীসর্বাণী মা) দেহ বোধে দেখলে আপনারা মায়ের কৃপা থেকে অনেক দূরে থাকবেন। শ্রীশ্রীমা দেহবোধের বাইরে। কিন্তু মা যখন আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা হয়ে ধরিত্রীতে আসেন, তখন আপন ভাবে ভক্তের চোখে মা হন দশভূজা দুর্গা; তখন মা দশভূজা দুর্গা হয়ে 'নারী' শক্তিরূপ ধারণ করে আসেন।''

শ্রীশ্রীমা সব শুনে বললেন —''প্রদীপ, যখন কেউ কোন সত্য দর্শন করে তখন সদ্‌গুরু আত্মগুরু হয়ে সেই সত্যদ্রষ্টার মানসপটে এই ভাবেই সত্যের রহস্যকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করান। সবই সেই সদ্‌গুরুরই কৃপা জানবে।''

প্রসঙ্গ (৫৯)

শ্রীশ্রীবাবার দীনহীন মানুষের প্রতি অপার করুণা :—

একদিন দুপুরবেলা (সম্ভবতঃ ১২-৩০মিঃ থেকে ১টার মধ্যে) বাবার কাছে গিয়ে দেখি বাবা তাঁর উপস্থিত সন্তানদের বলছেন যে, ''তোমরা এই দেয়ালের কোণ থেকে একটা একটা করে আম নিয়ে যাও আর বাড়ীতে গিয়ে সবাই মিলে খাও।'' দেখি! বাবার ঘরের কোণে এক গাঁটরি আমের সারি এবং উপস্থিত জনেরা বাবার কথামত একটা একটা করে আম সেখান থেকে বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি (বাপিদা) এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে সেখানে উপস্থিত অসীমদাকে এর কারণ জানতে চাইলে ওরা হাসতে হাসতে বলল যে, ''একটু আগে এক বৃদ্ধ একটি বড়সড় আমের বোঝা ঘাড়ে করে যেতে যেতে বাবার বাড়ির দোরের কাছে আসতেই বাবা বলে উঠলেন, 'বেচারার এই দুপুরে একটাও আম বিক্রি হয়নি। যা তোরা কেউ গিয়ে পুরো গাঁটরিটাই কিনে নে।' বাবার কথা মত সেখানে উপস্থিত কোন একজন সেই বৃদ্ধটির কাছ থেকে সমস্ত আমটাই কিনে নিল এবং তার কাছ থেকে জানতে পারলো যে সত্যিই সেদিন তার একটাও আম বিক্রি হয়নি। বৃদ্ধ লোকটি বাড়ির গেট থেকে কৃতজ্ঞতা বশতঃ বাবাকে প্রণাম করে চলে গেল।'' এখানে আমরা দেখতে পাই যে দীন গরীবের প্রতি বাবার কি অসীম করুণা — আবার কেউ কেউ বলল যে, এইভাবে বাবা আমাদের অমৃত রস পান করালেন।

প্রসঙ্গ (৬০)

ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না :—

বাবার ক্রিয়াবান শিষ্য ঘোষালদার মুখনিঃসৃত একটি ঘটনার কথা এখানে ব্যক্ত করা হল। —

একবার আমার (ঘোষালদার) পরিবার নিয়ে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে 'বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী'কে দর্শন করার ইচ্ছা মনে জাগল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লাহিড়ীদার (ঘোষালদা বাবাকে লাহিড়ীদা বলে সম্বোধন করতেন) কাছে অনুমতি চাইতে গেলে উনি বললেন, ''ঘোষালদা, আপনি আমার পূজাটাও বিন্ধ্যেশ্বরী মাকে দিয়ে দেবেন।'' — তারপর আমি বিন্ধ্যাচলে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী মাকে পূজা দেবার জন্যে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে লাইন দিলাম। বিশাল লাইন প্রায় তিনশো লোক পূজা দেবার অপেক্ষায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লাইনটা পাহাড়ের কোল ঘুরে, ঘুরে গিয়ে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমি কছিুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অধৈর্য্য হয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে মন্দিরে একটা ছোট্ট কাটা জানালার মত জায়গা দিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী মাকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, লাইনটা অনেকটা ঘুরে ঘুরে মন্দিরে যাচ্ছে বটে কিন্তু আমার জায়গা থেকে কোণাকুনি ভাবে পরিষ্কার 'মা'কে দর্শন করা যাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে এখান থেকে সরাসরি 'মা'কে পূজা দিই। এই ভেবে মন্ত্রপাঠ করে আমি আমার এবং লাহিড়ীদার পূজা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি বাড়ি ফিরে লাহিড়ীদার সাথে দেখা করে ওনাকে পূজার কথা বলার আগেই লাহিড়ীদা বলে উঠলেন, ''ঘোষালদা আপনার পূজা দেওয়া নিষ্ফল হল। নয় আরও ২/৩ ঘন্টা সময় যেতো, আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের সাথে অধৈর্য্য না হয়ে পূজাটা দিতেন। তা না করে আপনি ফাঁকি দিয়ে বাজীমাৎ করতে চাইলেন। সুতরাং এই পূজা দেওয়া আমি গ্রহণ করলাম না। এমন ক্ষেত্রে সস্তায় কিস্তিমাৎ হয় না।'' —অন্তর্যামী লাহিড়ীদার পায়ের কাছে বসে আমি আমার ভুলের ক্ষমা চাইলাম। উনি কিছুক্ষণবাদে স্মিত হাসি হেসে বললেন, ''ঘোষালদা, মন খারাপ করবেন না''; তারপরে আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যে বললেন, ''মা-তো সর্বত্রই আছেন।'' *...ক্রমশঃ*

—মাতৃ-পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

গীতা ভাবনা
(৩৬)

গীতা ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব :—

বেদ ও বেদোত্তর যুগ থেকেই কর্মফলবাদ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। কর্মবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও স্বরূপ গীতায় আলোচিত হয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে। আত্মার অবিনশ্বরত্বের চিন্তার সঙ্গে কর্মবাদ সম্পৃক্ত, যার একজন প্রধান বক্তা হিসাবে যাজ্ঞবল্ক্যকে দাঁড় করান হয়েছে। হয়তো বেদের আদিপর্বে প্রকৃতি উপাসনার মধ্যে তার বীজ থাকতে পারে কিন্তু সমাজে রাজ-তন্ত্রের উত্থানের পর কর্মবাদকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যার দরকার হয়েছিল মূলতঃ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে। গীতার কর্মবাদের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা এসবের বিস্তারে যাব।

মানুষকে নিয়ে যেহেতু সমাজ গড়ে ওঠে এবং সমাজের মূল নিয়ামকও মানুষ, তাই রাষ্ট্র-চেতনা, শ্রেণীচেতনা, নৈতিকতা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিচার করলে দেখা যাবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা যুগের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন রূপ নিয়েছে এবং তত্ত্বের ব্যাখ্যাও একরূপে থাকেনি। মানুষ আর সমাজকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী পণ্ডিতেরা যেভাবে শাস্ত্রকে ও গীতাকে দেখেছেন বৈদান্তিকরা অবশ্যই সেভাবে দেখেননি। তাঁদের দৃষ্টিগত পার্থক্য গীতার আলোচনার ক্ষেত্রে আসবে কারণ সমাজতাত্ত্বিক বস্তুবাদকে বাদ দিয়ে এখন কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যাই সার্বীক ভাবে স্বীকৃতি পায় না।

দেশে-দেশে কালে-কালে সমাজের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি ভারতীয় তথা বাংলার সমাজ জীবনেও বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন এসেছে। আগের আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব বা উনিশ শতকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব গোটা ভারতকে এবং তার ধর্মচেতনাকে পাল্টেছে। উনিশ শতকে বাংলার সমাজে দিক্‌পালদের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা আমাদের ধর্ম ও সমাজ চিন্তাকে নতুন স্রোতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। এনাদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণ।

১১৯৬ সালে বাংলা ইংরাজের অধিকারে যায় নি। ইংরেজ তখন দেওয়ান হয়েছিল মাত্র টাকার দায়িত্ব তাদের হাতে আর শাসনের ভার মিরজাফরের উপরে। দ্বৈতশাসন চলার পরবর্তীকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কম্পানি শাসনভার নিলেও সেভাবে উন্নতির চেষ্টা করেনি। ফলে বাংলায় আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের নেতাদের উপরে গীতার প্রভাব ছিল অসীম।

রামমোহনের থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির নবযুগ ধরতে হয়। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের পর থেকেই ভারতীয়রা পাশ্চাত্যধারায় আকৃষ্ট হচ্ছিল। সেই বিদেশীয় অবস্থা থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য রামমোহন একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈত ভাবনার বিস্তার ঘটাতে চাইলেন। এই কাজে উপনিষদ্‌, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতি রামমোহনের সহায়ক হয়। তাঁর উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্মের আদিরূপে গীতার প্রভাব ছিল। তিনি গীতার একটা ভাষ্য লিখিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের বিতত রূপ আদিব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই গীতার প্রভাব আছে। রামমোহন মূলতঃ সমাজসংস্কারক। সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এজন্য তৎকালীন পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁকে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সেখানে গীতার কথা একাধিকবার উক্ত হওয়ায় তাঁর আন্দোলনের পিছনে যে গীতার ভূমিকা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা না করলেও গীতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে যে বিদ্যাসাগর বলেছেন -'জীবনে গীতার উপদেশ অনুসারে চলাই শ্রেয়'।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি:— *হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যার সংগ্রহ (জুন ২০০৮ থেকে অক্টোবর ২০১৪) ও তৎসহ ভর্গজ্যোতি পত্রিকার তিনটি সংখ্যা (২০০৭-২০০৮) আশ্রমে হিরণ্যগর্ভ কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে। মোট মূল্য ৫৩৫/-টাকা (ডাক খরচ অতিরিক্ত)।*

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২১)

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃ শুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎকিঞ্চিদাত্মগোচরম্।। ৬৬

গুরুণা (সদ্‌গুরুণা) দর্শিতে মার্গে (গতিং লব্ধা) মনঃশুদ্ধিং (মনসঃ শুদ্ধিং) চ কারয়েৎ (এবং কৃত্বা জগৎসম্বন্ধি) যৎকিঞ্চিৎ অনিত্যং আত্মগোচরং (অস্তি), তৎ সর্ব্বং খণ্ডয়েৎ।। ৬৬

পরুন্তু জীব আকার বিশিষ্ট সুতরাং নিরাকার বুঝে না, এবং ভাব সমন্বিত বলিয়া ভাবাতীত ভাবও বুঝে না; সে কারণ ইন্দ্রিয় মধ্যে পতিত অন্ধজীবের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ধারণা হয় না; সে কারণ বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয় মধ্য দিয়া সদ্‌গুরু প্রদর্শিত মার্গ দিয়া গতি করিতে হইবে, জড় মূর্তিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মমূর্তি পরে সূক্ষ্মাণু মূর্তিতে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই মনঃশুদ্ধির উপায়, অর্থাৎ মনের আবরণ স্বরূপ যে ইন্দ্রিয় বিষয়রূপ মল মনকে আবরিত করিয়া উহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নিবারিত হইয়া মন স্বচ্ছভাব লাভ করিলে ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখন মনের গোচরীভূত যে সমস্ত অনিত্যজ্ঞান (অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্যবোধে মিথ্যাজ্ঞান) দূরীভূত হইবে, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিবে, ক্রিয়ার পরাবস্থাই ব্রহ্মের রূপ এবং সেই অবস্থা লাভ করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইল। ৬৬

জ্ঞেয়ং সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যান্নান্যোহপ্যাত্মদ্বিতীয়কঃ।। ৬৭

জ্ঞেয়ং (যৎ নিত্যমিব প্রতীয়তে) তৎ সর্বং অনিত্যঞ্চ (অনিত্যমেব জানীয়াৎ), (দ্বিতীয়ং কিঞ্চিৎ নাস্তি অতএব) মনঃ (এব) জ্ঞানম্ (জ্ঞানস্বরূপং) উচ্যতে, (অতএব) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যাৎ; অন্যঃ (কশ্চিৎ) অপি আত্মদ্বিতীয়কঃ ন (অস্তি ইতি শেষঃ) ।। ৬৭

ব্রহ্ম ছাড়া অপর যাহা কিছু জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় বলিয়া অনুমিত হইতেছে, উহারা সকলই কাল্পনিক বলিয়া অনিত্য, অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানে নিত্যজ্ঞান হয় না। মনই জ্ঞানস্বরূপ, উহার বাহ্য সংস্কার ঘুচাইয়া উহাকে নির্মল কর, তখন দেখিবে যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় দুইই এক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যখন এক হইল তখন দ্বিতীয় কিছু নাই বলিয়া কি-ই বা জানিবে এবং কাহাকেই বা জানিবে? সুতরাং জানাও নাই এবং জানিবার বিষয়ও নাই, অতএব ব্রহ্মকে যে আমি ও তুমি সম্বোধনের দ্বারা পরভাবে দেখিতেছ, তাহাও যথাযথ নহে, মন নিষ্কল ভাবাপন্ন হইলে উহাই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মভাব, বা মনের আত্মভাব; পরভাবে দর্শন উহাই মনের কল্পনারূপ কলঙ্ক, অতএব মনই আত্মা এবং মনের অতীত আত্মীয় বলিবার দ্বিতীয় অপর কিছুই নাই।।৬৭

এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।। ৬৮

হে মহাদেবি! এবং শ্রুত্বা (পূর্বকথিতং গুরুমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা) যঃ (জনঃ) গুরুনিন্দাং করোতি, সঃ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ঘোরং নরকং যাতি।। ৬৮

হে মহাদেবি, এইরূপ গুরুমহিমা শুনিয়াও যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা করে, সে ঘোর নরকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর পতিত থাকে।। ৬৮

সূর্য্য তাপ ও আলোক দানে জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, নচেৎ অন্ধকারময় ও শৈত্য গুণবিশিষ্ট জগৎ তাপ ও আলোক অভাবে থাকিতে পারে না। সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্র মন্থনে রসগুণ বিশিষ্ট চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়া, তিনি আকাশে স্থিতি সম্পন্ন হইলেন (গীতা ১৫ অঃ, ১৩ শ্লোক দেখ)। সূর্য্য তাপ দিতেছেন এবং রসাত্মক চন্দ্র রসগুণ বিতরণ করিতেছেন, এই উভয়বিধ গুণের দ্বারা জগতের সাম্যভাব রক্ষিত হইতেছে। পরন্তু এই চন্দ্রেরও অন্ত আছে এবং সূর্য্যেরও অন্ত আছে — ইঁহারাও সময়ান্তরে মহাকালে মিশিবেন। জগতের রক্ষকদ্বয় সূর্য্যচন্দ্রের রক্ষণাভাবে জগতেরও বিলোপ হইবে, জগৎও মহাকালে মিশিবে ইহাই মহাপ্রলয়। সে কারণ মূল শ্লোকে বলা হইতেছে যে যাবৎ এই মহাপ্রলয় না উপস্থিত হইতেছে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত গুরুদ্রোহী জীবকে সূর্য্য চন্দ্রের কৃপাবর্জিত হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকিতে হয়। এই দেহকেই ক্ষুদ্রজগৎ বলে। জীব মনাকারে এই দেহ মধ্যে বাস করিতেছে, এবং চন্দ্রাকারে তাহার ঊর্দ্ধে গতি হইয়া সূর্য্যের নিকট হইতে বুদ্ধি স্বরূপ প্রভা সংগ্রহ করিয়া নিম্নজগৎকে সে আলোকিত করিতেছে। জগৎ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি বলিয়া জগতের সংস্কাররূপ রসগুণ তাহাতে আছে, এবং এই রসগুণের দ্বারা সে সূর্য্যের তাপকে প্রশমিত করিতেছে, নচেৎ প্রখর সূর্য্যতাপে জগৎ নিজ উৎপত্তিস্থানে সূর্য্যে গিয়া মিশিত, এবং জগতের লয় হইত। পরন্তু রসধাতুর আধিক্য হইলে (অর্থাৎ মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অভিভূত হইলে) চন্দ্রতারা সূর্য্যলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্ন জগতে খসিয়া

পড়ে (অর্থাৎ মন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতিত হয় (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ), এবং জীবের অন্ধকারময় পাতালে গতি হয়। পাতালে নরকের স্থিতি আছে, তথায় গিয়া মৃত্যুযন্ত্রণারূপ বহুবিধ যন্ত্রণা সে ভোগ করে, শেষে যন্ত্রণার পরিসমাপ্তিতে জীবের জড়বৎ পরিণতি হয়।। ৬৮

...ক্রমশঃ

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(৪)

সদ্‌গুরু মাহাত্ম্য— (পূর্ব প্রকাশিতের পর....)

শ্রীশ্রীমা: আধ্যাত্মিক পথে আসতে গেলে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে তুমি কি চাইছ? — জাগতিক সুখ চাইছ না আধ্যাত্মিক বিষয়ের সত্যকে জানতে চাইছ? আধ্যাত্মিকতায় প্রথমেই জানতে হবে 'আমি' কে? আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব? — অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান বা আত্মার খোঁজ। তোমার ভিতরে যে সত্তাটা আছে, যে বোধ করাচ্ছে, সেটা কোথায় বা সেটি কি রকম? দেখো, তুমি কি চাইছ সেটাও তোমায় জানতে হবে আর কি চাইছ না সেটাও তোমায় জানতে হবে।

ব্যক্তি: আমি কি চাইছিনা, সেটা আমি কিছুটা জানি আর আমি কি চাইছি সেটা আমি জানি না।

শ্রীশ্রীমা: কি চাইছ তুমি সেটাও তোমাকে জানতে হবে আর জেনে তোমার আমিত্বকে পরিত্যাগ করতে হবে। 'আমি' কি চাইছি, সেটি না জেনে নিজস্ব অহং-এর বশবর্তী হয়ে যারা সত্যের সন্ধানে চলার জন্য ভাবে তাদের ঐরকম উদ্‌ভ্রান্তের মত জন্ম-জন্মান্তর কাটতে থাকে। কিছুই লাভ হয় না, শুধুমাত্র কর্মফল সঞ্চয় হয়ে প্রারব্ধের চক্করে পড়ে কেবল কালচক্রে ঘুরতে থাকে। যে সদ্‌গুরু মহিমা বোঝে না, তার অন্তরে শুভেচ্ছা জাগ্রত হয়নি বুঝতে হবে। তাকে কোন মহাত্মার আদর্শকে গ্রহণ করে গুরুকরণ করে সমর্পণ করতে হবে। দেখো, তুমি নাগপুর থেকে এলে; তুমি নাগপুরের রাস্তাটা ধরলে, তারপর এইখানের পথ চিনলে। তুমি একটি route জানলে, হয়তো এই পথের সন্ধান তুমি কারো কাছে পেয়েছ। এবার তুমি যদি দশটা রাস্তার খোঁজ করো, এখানে আসবার জন্য, তবে তোমার এখানে পৌঁছতে দেরী হবে নিশ্চয়ই। তোমাকে ভগবান একটি রাস্তা দেখিয়ে দিলেন; এবার তুমি যদি মনে করো যে সেই রাস্তাটায় গিয়ে 'আমি খুব একটা আরাম পেলাম না, আবার অন্য একটা রাস্তা খুঁজি', তখন তুমি আবার ভুল করে দেখবে যে ওখানেই এলে — তো সারাজীবন রাস্তায়ই ঘুরপাক খেতে খেতে কেটে যাবে। আর সত্যের সন্ধান করবে কখন? দেখো, যাঁরা প্রকৃত মহাত্মা হন তাঁরা বেশীরভাগই নিজের দেশ, নিজের আসন ছেড়ে কোথাও যান না। যেমন, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতা, শ্রীশ্রীরামঠাকুর, শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীসীতারামদাস বাবা, শ্রীতৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নামদেব, তুকারাম, নানক, কবীর ইত্যাদিরা তীর্থভ্রমণ ভিন্ন বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া নিজের স্বদেশের আসন ছেড়ে কোথাও যান নি, প্রয়োজনও হয়নি। যাঁর কাছে পরমার্থ থাকে, তিনি সর্বদা ভগবৎ মহিমায় যুক্ত অবস্থায় থাকেন, ভগবৎ-নির্দেশে সব কিছু করেন, ভগবানের নাম প্রচার করেন, তিনি ভগবৎ ক্ষেত্র ছেড়ে কোনদিন কোথাও যান না। ভারতবর্ষ চিন্ময়ভূমি, মহাত্মাদের নাম যশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা জীবের কল্যাণ সাধন করে শান্ত অবস্থায় অবস্থান করেন। সত্যকে খোঁজো, হুড়োহুড়ি এবং জটিল চিন্তা করে কোন লাভ নেই। তুমি জানবে, অন্তরে প্রত্যেকেরই আলোর spark আছে। তোমায় আমি মনে মনে যদি একটি চিন্তার তরঙ্গ প্রেরণ করি — একটি spark দেখবে। আমার দীক্ষিত সন্তানেরা জানে কূটস্থে spark light-এর দর্শন কি জিনিস। শুধুমাত্র spark কেন? আত্মজ্যোতি! অনাহত চক্রের মধ্যে দিয়ে হৃদয়-কমলটা কি ভাবে দেখা যায়, এখানে আমার দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তা জানে। এটি মহাবতার বাবাজী মহারাজের চিন্ময় ক্ষেত্র। মহাবতারের সঙ্গে তাঁর পরিমণ্ডলের আসা-যাওয়া এখানে সব সময় রয়েছে। আমি তাঁরই শরণাগত, তাই কূটস্থের ব্যাপারগুলি বুঝতে শিখেছি। তোমরাও সদ্‌গুরু শরণে এসো, চিন্ময় জ্যোতির স্পর্শ পাবে নিশ্চয়। আমার যিনি সদ্‌গুরু ছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহ ছিল তাঁর। তিনি হঠযোগ, তন্ত্রযোগ, ক্রিয়াযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। দেখো, সাধন জীবনে চলার পথে অনেক দৃশ্য আসবে, সেগুলিকে দেখবে কিন্তু তাই নিয়ে বুঁদ হয়ো না। ওটা ধ্যান নয়। মায়ামুক্ত হোচ্ছ কি না সেটা লক্ষ্য করো। আমিত্ব-মুক্ত হোচ্ছ কি না সেটা নিজের ভিতরে অনুভব করো আর সদ্‌গুরু শরণাগত হও।

...ক্রমশঃ

মহাপ্রস্থানের পথে
(২)

এগিয়ে চলি মহাপ্রস্থানের পথে। এসে পৌঁছাই দুই বিরাট হিমবাহের সঙ্গমস্থলে। নদীর স্বচ্ছনীল জলের চিহ্ন চোখে পড়ে না। দুই দিকেই ছড়ানো ভাঙা পাথর ও ধুলোবালি মাখা বরফের স্তূপ। হিমবাহদুটিকে দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন রক্তহীন বিবর্ণ দুই বাহুর মিলন। হাতে হাত মিলিয়ে দুই বিশাল কঙ্কালের মতো পড়ে আছে। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও গলে যাওয়া বরফের ফাঁকে আঁধার ভরা গহ্বর, যেন কঙ্কালের দৃষ্টিহারা চোখের শূন্য কোটর। অলকানন্দার হিমবাহে এসে পৌঁছেছি। পথের উপরের বরফ এখন এখানে অনেক জায়গায় গলে গিয়েছে। তবে চারিদিকের বরফের পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বরফের খোলস ছেড়ে এখানে ওখানে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের নানা আকারের রাশি রাশি পাথর। পথ রেখা নেই, যেখান দিয়ে কোনো রকমে যাওয়া যায় সেইখান দিয়েই যাই। সেই আমাদের পথ। শুধু গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আছে। পথ জুড়ে বড় বড় পাথর পড়ে। হাতে ভর দিয়ে একটা পাথরের উপর উঠে আর একটা পাথর ডিঙিয়ে চলি। সঙ্গী কুকুরই পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। খানিকটা ছুটে যায়, দাঁড়ায়, পিছন ফিরে তাকায়, ঠিক আসছি দেখে আনন্দে লেজ নাড়ে। আবার এগিয়ে চলে, আবার দাঁড়ায়, ফিরে তাকায়। পিছিয়ে পড়েছি দেখে ছুটে ফিরে আসে কাছে। কিছুক্ষণ সঙ্গে চলে। আবার এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ থেকে জলপড়ার প্রচণ্ড শব্দ পাচ্ছিলাম। এবার তার কারণ দৃষ্টিগোচর হল। বাঁদিকে নীলকণ্ঠ পর্বত, তারই অঙ্গ বেয়ে বহু ধারা নেমেছে। দীর্ঘদিন যে তুষাররাশি পর্বতের অঙ্গীভূত হয়ে স্থির ও স্তব্ধ ছিল, গ্রীষ্মের খরতাপ, সূর্য্যের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙেছে সেই নির্ঝরিণীদের। আকাশ ছোঁওয়া পাহাড়ের মাথা থেকে ধারাগুলো নেমে আসছে ধরণীর বুকে মুক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে। এখানে এর পরিচয় সহস্রধারা নামে। সামনেই পাঁচটি বড় বড় প্রপাত চোখে পড়ে। এই সেই পঞ্চধারা তীর্থ যা পুরাণ কথিত বদ্রীনারায়ণ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনায় হিমগিরির নৈর্ঋত দিক্‌ভাগে অবস্থিত বলে বর্ণিত আছে। সেই ধারাগুলি নেমে যেখানে নদীর আকারে বয়ে চলেছে সেখানে পৌঁছলাম। ওপারে যেতে হবে। পুল নেই, তার প্রয়োজনও নেই কেননা জলের গভীরতা নেই। সমতলভূমিতে জলস্রোতগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছোটায় খুব বেশী টান নেই। তবে তুষার গলা জল বরফের থেকেও ঠাণ্ডা। সাবধানে পেরিয়ে আসি। ওপারে গিয়ে সামান্য চড়াই তারপর আবার উঁচুনীচু পথচলা। অল্প বৃষ্টি নামে, তারমধ্যেই বর্ষাতি কোট গায়ে চলি। দেখতে দেখতে জোরে বৃষ্টি নামে। পথের পাশে ছোটো একটা গুহায় আশ্রয় নিই। হু হু করে বাতাস ঢোকে। কনকনে শীত। বৃষ্টি থামলে ফের পথচলা শুরু। সামনে শিরদাঁড়া পথ — Razor Edged Ridge। একটা সরু লাইনের উপর দিয়ে চলা। দুই দিকেই পাহাড়ের ঢালু গা। নীচে তিন-চারশ ফুট সোজা নেমে গিয়েছে। একটু বেপথ হলেই শেষ। এখানে দেহত্যাগ হয়েছিল নকুল আর সহদেবের। ভূপিন্দরের কথামত এপাশ ওপাশ নয় শুধুমাত্র পায়ের উপর নজর রেখে পেরিয়ে আসি ওই শিরদাঁড়া পথ। এসে পৌঁছোই চক্রতীর্থে। সার্ভে ম্যাপে যা 'মাজনা' নামে উল্লেখিত। এই চক্রতীর্থেই তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে পাশুপত-অস্ত্র লাভ করেছিলেন অর্জুন। মহাপ্রস্থানের পথে এখানেই তাঁর দেহত্যাগ হয়েছিল।

চক্রতীর্থে প্রান্তরের চারিদিকে আকাশচুম্বী গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে প্রায় চক্রাকারে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। মনে হয় পাহাড়ে ঘেরা যেন গোলাকার হ্রদ ছিল এখন শুকিয়ে গিয়ে পাথর বিছানো ময়দান রূপে পড়ে আছে। তারই বুকে দুই একটা ঝরণার ধারা এখনও এঁকে বেঁকে চলেছে। প্রান্তরের একটু উপরে রাশিকৃত পাথরের মধ্যে কয়েকটি গুহা, তারই কাছে তাঁবু ফেলা হল। তুষার শিখরগুলোর উপর অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি পড়ে বিচিত্র বর্ণের ছটা ফোটে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। আকাশের লাল আলো ম্লান হয়। বাতাসের হিমস্পর্শ শিহরণ জাগায়। তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড শব্দ শুনি। মেঘহীন সুনীল আকাশ, আকাশ জুড়ে তারার মেলা। মেঘ বা বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই তবুও ফের বজ্রপাতের শব্দ কিন্তু নেই কোনো বিদ্যুতের ঝলক। পরদিন সকালে চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলেছি। মাথাও একটু ভার ভার লাগছে, বুঝি হাই-অল্টিচ্যুড সিকনেস্। অল্প

চড়াই। চড়াই শেষে পাহাড়ের অপরদিকে নামা। আবার উঁচুনীচু পথ। কখনো কখনো আবার শিরদাঁড়া পথ। চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে হঠাৎ শুনি গতরাত্রের সেই বজ্রপাতের শব্দ। দেখি দূরে নীলকণ্ঠ পর্বতের গা থেকে বরফের স্তূপ ভেঙে পড়ছে - হিমানী সম্প্রপাত — Avalanche। পাহাড়ের নীচের অংশ ধূসর ও পিঙ্গলবর্ণ। তুষার শূন্য। চক্ষের পলকে দেখি উপরের সেই শুভ্র বাষ্পমণ্ডলী ভেদ করে সাদা বরফের লেলিহান জিহ্বা নীচে সেই পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছে। চারিদিকে ছোটো বড় শব্দ ওঠে। এপারের পাহাড়গুলি সেই শব্দ লোফালুফি করে প্রতিধ্বনি তোলে। তারপর হঠাৎ আবার সব শান্ত, শব্দহীন, গতিহীন। যেন স্বপ্ন — কোথাও কিছু ঘটেনি; অথচ দূরে দেখি এই ক্ষণিক প্রলয়ের রেখে যাওয়া সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি। এই কিছু আগে যেখানে বরফ ছিল না, সেখানে বরফ ছেয়ে গেছে। যে তুষার স্তূপ থেকে হিমানী সম্প্রপাত হল সেখানে অবশিষ্ট তুষার অঙ্গে অপূর্ব বর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বরফের সাদা ধবধবে রূপ আর সেখানে নেই। ভেঙে যাওয়া অংশে নীল সবুজ স্বচ্ছ শক্ত তুষার দেখা যায় যেন ভাঙা নীল কাঁচের বোতল, তারই উপর সূর্য্যের কিরণ বর্ণবিন্যাস জাগায়। এতক্ষণে বোঝা গেল গতরাতের বিনা মেঘে বজ্রপাতের শব্দের কারণ। ভীষণ সুন্দর একেই বলে।

শতোপন্থ তাল

শিরদাঁড়া পথ দিয়ে চলেছি অতি সাবধানে কোনরকমে পায়ের উপর ভর রেখে শরীরের ভার সামলে। ডাইনে বাঁয়ে দুপাশেই গভীর খাদ। কুকুরটা দেখি পথ ছেড়ে এক জায়গায় নীচের দিকে নেমে গেল। যাবার আগে কবার ডাকাডাকি করল। তারপর নীচে গিয়ে সোজা এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার ছুটে উপরে আসে মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়ের নীচের অংশ দেখায়, ছুটে সেদিকে নেমে যায় - আবার উপরে উঠে আসে। বেশ বোঝা যায় সে আমাদের নীচে যাবার জন্যই বারবার সংকেত করছে। ভূপিন্দরকে সেকথা বললে সে বলে আমরা ঠিক রাস্তা দিয়েই চলেছি। হঠাৎ মনে পড়ে গুরুমায়ের একটি কথা। ‘‘পথের মধ্যে যদি কোথাও দেখিস্ তোর চলার পথে কেউ বাধা দিচ্ছে তা সে কুকুর, বানর বা একটা মাছিই হোক না কেন জানবি সে আমারই নির্দেশ।’’ মায়ের কথা স্মরণ করে দাঁড়িয়ে যাই। ভূপিন্দরকে জানাই উপরের রাস্তায় নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা আছে আমরা বরং নীচের রাস্তাটা ধরেই চলি। আমার কথায় নিমরাজী হয়ে সে পথ পাল্টায়। কুকুরের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে যাই। একটু এগোতেই দেখি উপরের রাস্তাটা ধসে গেছে। এগোনোর পথ নেই। লেজ নেড়ে কাছে ছুটে আসে কুকুরটা। তার ভাবভঙ্গি যেন - কেমন, বলেছিলাম তো, উপরের রাস্তা বন্ধ, নীচের রাস্তা ধরেই যেতে হবে; তোমরা আমার কথা শুনছিলে না। ভূপিন্দরও অবাক! আমার মনে আনন্দের জোয়ার। মায়ের স্নেহের পরশ পাই। বুঝি সবক্ষেত্রেই তিনি আমাকে আগলে রেখেছেন।

ধীরে ধীরে পথ চলি। ছড়ানো বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া কতগুলো ঝরণাধারা পাই। জমির উপরে পাথরের আশেপাশে এখানে এখনও সাদা বরফ জমে রয়েছে। কোথাও বা বরফ গলে জলের স্রোত নামছে। জলে বরফের টুকরোও ভেসে চলেছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ধারাগুলো পার হই। বরফের উপর অতি সাবধানে পা ফেলি। সামনে উঁচু লম্বা বাঁধের মতো একটা জায়গা। ধীর পায়ে উঠে আসি। আর উপরে উঠেই বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হয়ে যায়। সামনে ত্রিকোণাকৃতি শতোপন্থ তাল। শুনি তিনকোণে তিন দেবতার অধিষ্ঠান — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা সেখানে ধ্যানরত। কোথাও কোনো মন্দির নেই। প্রকৃতির প্রাকৃতিক দেবায়ন। উপরে সুনীল আকাশ, চারধারে অমল ধবল তুষার প্রাকার যেন শ্বেতপাথরের তৈরী। নীচে বিস্তীর্ণ বারিরাশি - নিস্তরঙ্গ স্ফটিক স্বচ্ছ প্রশান্ত সরোবর। যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠে দোলে নীলকান্তমণি। দুর্গম পথের অশেষ ক্লান্তি নিমেষে অন্তর্হিত হয়। গতিবেগ সংযত করে ধীরপদে হ্রদের তীরে নেমে চলি। প্রাণভরা অসীম আনন্দ। হ্রদের তীরে তাঁবু পড়ে। শতোপন্থের উচ্চতা ১৪,৪৪০ ফুট, চওড়া ৬৪০ ফুট। বদ্রীনাথ থেকে ২২ কিলোমিটার। চক্রতীর্থ থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার। শতোপন্থের জলে স্নান করে নির্মল হই।

পরের দিন ফের চলা - সোমকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ডের দিকে। আজও সেই শিরদাঁড়া পথ। তেমনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে

পথ চলা। সামনে ছোটো একটা হ্রদ, নাম 'সত্যপদ হ্রদ'। সেখান থেকে আরও ঘন্টাখানেকের পথচলা - তারপর সোমকুণ্ড। তুষার গলা জল তবে পরিমাণে অল্প। কুণ্ডটি ছোটো - পরিধি প্রায় চল্লিশ ফুট। আদতে আর্তেজিয় কূপ। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে কুণ্ডের জলের পরিমাণও কমে, বাড়ে। অমাবস্যায় সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়ে যায়, পূর্ণিমাতে হয় জলপূর্ণ। সোমকুণ্ড থেকে আরও ঘন্টাখানেকের পথ সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ড ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। সামনে কিছুদূরে গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণী। হিমবান্ মহাশৈল। এরই নাম বদ্রীনাথ পর্বত। সার্ভে ম্যাপ-এর তথ্য অনুযায়ী চৌখাম্বা। এর একপাশ দিয়ে নেমে এসেছে শতোপন্থ হিমবাহ, অপর দিকে নেমে গিয়েছে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার। এই পর্বতের গিরিপথ দিয়ে যেতে পারলে মদমহেশ্বরে নামা যায়। অন্য এক পথে পৌঁছানো যায় কেদারনাথেও তবে এরজন্য পর্বত আরোহণের বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয় আর সেই সঙ্গে দরকার অভিজ্ঞতা, সরঞ্জাম আর সাহস। সামনের দিকে হাত দেখিয়ে ভূপিন্দর বলে ওই দেখুন স্বর্গারোহিনী। তাকিয়ে দেখি সত্যিই বরফাবৃত পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠেছে সিঁড়ি। পর্বতের শিখর থেকে ভেঙে পড়া বরফের স্তুপ স্তরে স্তরে নেমে এসেছে। বোঝা যায় হিমানী সম্প্রপাতের ফল। কোথাও বা হিমবাহের স্বাভাবিক নিম্নমুখ জমাট তুষারের গতিপথ। দূর থেকে সিঁড়ির ধাপের মতো দেখায়। তুষার শিখর থেকে সাদা মেঘের পুঞ্জ বাতাসে ভেসে ভেসে নীল আকাশে উঠতে থাকে। ভাবি ঐরকম মেঘের অন্তরালে বুঝি অন্তর্হিত হয়েছিল স্বর্গের রথ।

এবার ফেরার পালা। ধীরে ধীরে নেমে আসি শতোপন্থের পারে। সেখান থেকে চক্রতীর্থ। একরাত চক্রতীর্থে কাটিয়ে নেমে আসি লক্ষ্মীবনে। সেখান থেকে মানাগ্রাম। নেমে দেখি যেন প্রলয় হয়ে গিয়েছে নীচে। উপরে তেমন বৃষ্টি না পেলেও নীচে প্রবল বৃষ্টি পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। বদ্রীনাথ হৃষিকেশ হাইওয়ের স্থানে স্থানে ধস নেমেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ। আশ্রয় নিই ভারত সেবাশ্রম সংঘের অতিথি নিবাসে। রাতে হঠাৎ ফোন আশ্রম থেকে শিবদার, "তুই তো রুদ্রপ্রয়াগে নেই। মায়ের সাথে কথা বল।" শিবদার (স্বামী সদাশিবানন্দ) কাছ থেকে ফোনটা নিয়েই মায়ের মধুর বার্তা — "এত দূরেই যখন যাবি তখন বলে গেলি না কেন? আমাকে একবার বলে গেলে তো ব্যাসপীঠও ঘুরে আসতে পারতিস্। তুই তো ব্যাসপীঠের পাশ দিয়েই চলে গেলি।" আমার তখন মনে হচ্ছে মাকে না জানিয়ে এসে কী ভুলই না করেছি। যাই হোক মায়ের কথামত পরদিনই একটা বিশেষ গাড়িতে নেমে এলাম হরিদ্বার। সেখান থেকে কলকাতা। বাড়ি ফিরেই ছুটলাম আশ্রমে। মায়ের মুখে সেই স্মিত হাসি। "যাক্ ফিরেছিস্ তাহলে।" — বড় মধুর, বড় আপন সেই কথা কয়টি।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

-সমাপ্ত-

পুরাণ কথা

রেবতী নক্ষত্ররূপা কন্যা রেবতী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ঋতবাক্ নামক এক মুনি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রের জন্মাবধি ঋতবাক্ মুনি ও তাঁহার পত্নীর নানারূপ পীড়ায় দুর্ভোগ হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন সেই পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতিশয় অধর্মাচারী হইল। ঋতবাক্ তজ্জন্য অতিশয় মনঃকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা তিনি গর্গ মুনিকে সকল কিছু নিবেদন পূর্বক, কাহার দোষে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হইতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গর্গ মুনি বলিলেন যে ঐ পুত্র রেবতী নক্ষত্রের অন্তভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। তখন ঋতবাক্ মুনি রেবতী নক্ষত্রকে অভিশম্পাত করিলেন এবং সেই অভিশাপে রেবতী নক্ষত্র আকাশ হইতে কুমুদ পর্বতে পতিত হইল। সেই সময় হইতে কুমুদ পর্বতের নাম 'রৈবতক' হইয়াছে। সেই নক্ষত্রের কান্তি হইতে এক পদ্ম সমাকুল সরোবরের সৃষ্টি হইল এবং সেই সরোবর হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা উদ্ভুতা হইলেন। মুনি ঋতবাক্ সেই কন্যার নাম রাখিলেন 'রেবতী'।

কালে রৈবতক গিরির কন্যা বলিয়াও রেবতী পরিচিতা

হইলেন। প্রমুচ নামে একজন রাজর্ষি রেবতীকে কন্যার মত পালন করেন। রাজর্ষি প্রমুচ যজ্ঞাগ্নি সকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ হইবে। অগ্নি তখন বলেন যে বিক্রমশীলের পুত্র রাজা দুর্দ্দম বা দুর্গমের সহিত রেবতীর বিবাহ হইবে। কালক্রমে দুর্দ্দম নৃপ মৃগয়ায় বাহির হইয়া প্রমুচের আশ্রমে উপনীত হইলে রাজর্ষি প্রমুচ তখন তাঁহার সহিত রেবতীর বিবাহ দিতে চাহিলে তখন কন্যা রেবতী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে রেবতী নক্ষত্র ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে তিনি বিবাহ করিবেন না। রেবতীর পালকপিতা প্রমুচ যখন কোনমতেই রেবতীর মত পরিবর্তন করাইতে পারিলেন না তখন অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য ঋক্ষকে গগনে স্থাপিত করিয়া প্রিয়ব্রত বংশীয় বিক্রমশীল রাজার পুত্র দুর্দ্দমের সহিত রেবতীর বিবাহ দিলেন। অতঃপর রেবতীর গর্ভে 'রৈবত' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রই 'রৈবত মনু' নামে খ্যাত হন।

কাহিনীর গূঢ়ার্থ :— পৃথিবীর আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন নামধারী নক্ষত্রগুলি সকলই চিন্ময় এবং উহার যে দেব বা দেবী রূপও রহিয়াছে, ইহারই প্রমাণ স্বরূপ উপরিউক্ত এই কাহিনী। যেমন সপ্তর্ষি মণ্ডলের সপ্তর্ষিগণের চিন্ময় নাম এবং রূপের অস্তিত্ব আছে, যার প্রমাণ আমরা বেদ, পুরাণ হইতে পাই, ঠিক তেমনই অনুরাধা, স্বাতী, ভরনী, কৃত্তিকা ইত্যাদিরও দেবীরূপ আছে। ঋক্ষ, শুক, ধ্রুব ইত্যাদি দেব নক্ষত্রেরও অস্তিত্ব আছে। আকাশতত্ত্বে পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন যোগী-ঋষিগণ নক্ষত্র মণ্ডলের প্রকৃত রহস্য অবগত হন।

(বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংগৃহীত কাহিনী)

ভাগবৎ-কথা

শিবাত্মজা নর্মদা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

কোনও সময়ে ভগবান শিব চরাচর জগতের কল্যাণ কামনায় ঋক্ষ পর্বতে আরোহণপূর্বক সর্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যা কালে শিবের দেহ হইতে যে স্বেদ নির্গত হয় তাহা হইতে এক নদীর উদ্ভব হয়। সেই নদীই নর্মদা। সেই নর্মদা নদী শিব-আত্মজা স্বরূপ এবং শিবের বরে তিনি সত্ত্বোর্জ্জিতা গঙ্গার তুল্য পূজনীয়া এবং সর্বাবস্থায় পবিত্রা।

কল্পের শেষে যখন সমুদয় জগৎ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তখন ভগবান হর নিখিল জগৎ উদরে ধারণ করতঃ প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ান ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার সহস্রযুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। ঐ সময় শিবকন্যা নর্মদা শঙ্করের পাদমূলে অবস্থান করিয়া তাঁহার পাদ সংবাহনে বৃতা ছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশকে ঐভাবে নিদ্রিত দর্শন করিয়া তখন বেদচতুষ্টয়ের দ্বারা পরম ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্তব করিতে করিতে হঠাৎ বেদচতুষ্টয় প্রলয় পয়োধিজলে বিলীন হইয়া যায়। বেদ জলধিজলে নিমগ্ন হইলে পিতামহ ব্রহ্মাও অজ্ঞান-অন্ধকারে বিলীন হইলেন। তখন মহাদেবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার স্তবে ও আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়া শঙ্কর তখন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাশ্ববর্তী নর্মদাকে বেদ লুপ্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নর্মদা তখন শিবের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে মহেশ যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বেদপাঠ নিরত ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ পূর্বক সাগর সলিলে লুকাইয়া আছে। নর্মদার কথা শুনিয়া তখন শিব বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রই ভগবান বিষ্ণু মীনরূপ ধারণ পূর্বক জলে নিমগ্ন হইয়া পাতাল হইতে বেদ আহরণ পূর্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। দেবাদিদেব মহেশের একমূর্তিই প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রি-গুণান্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদির ন্যায় গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতীও সেই রুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা। গঙ্গা তাঁহার বৈষ্ণবী মূর্তি, নর্মদা শৈবী মূর্তি এবং সরস্বতী তাঁহার ব্রাহ্মী মূর্তি।

(বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংগৃহীত)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

দোল পূর্ণিমা — ২১শে মার্চ, বৃহস্পতিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৪শে মার্চ, রবিবার
অন্নপূর্ণা পূজা — ১৩ই এপ্রিল, শনিবার
রাম নবমী — ১৪ই এপ্রিল, রবিবার
নববর্ষ — ১৫ই এপ্রিল, সোমবার

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪৯ : 'গায়ত্রী' কি ও গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : গায়ত্রী মন্ত্রার্থের সংক্ষিপ্ত সার — 'গায়ত্রী' প্রধানতঃ একটি বৈদিক ছন্দ এবং এই ছন্দেই গায়ত্রী মন্ত্র রচিত। ঋগ্‌বেদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র এটি — 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।' — বিশ্বামিত্র ঋষি এই মন্ত্রবর্ণের দ্রষ্টা বলিয়া তিনিই এই মন্ত্রের ঋষি। এই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন সবিতা সূর্য্য, যিনি জগৎ প্রসবিতা, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম। এই মন্ত্র প্রয়োগ হয় প্রাণায়ামের সময়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জগতের সকল কিছুর উপরে প্রাণশক্তির ঊর্ধ্বায়ণ প্রমাণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে গায়ত্রী প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'গয়' অর্থাৎ প্রাণ সমূহকে ত্রাণ করে বলিয়াই তাঁহার নাম গায়ত্রী। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে এই দৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু পদার্থ তাহা সমস্তই গায়ত্রী স্বরূপ। বাক্ বা শব্দই গায়ত্রী, বাক্‌ই এই সমস্ত প্রাণীজগতের গান করিয়া থাকে এবং বাক্‌ই সকল প্রাণীকে অভয় দিয়া ত্রাণ করে। তাই গায়ত্রী মন্ত্রসাধন-কারীকে বলা হইয়াছে যে যথাযথ উচ্চারণে গায়ত্রী পাঠ করিতে পারিলে গায়ত্রী সাধককে ত্রাণ করেন।

মূল গায়ত্রী মন্ত্রের দুটি অঙ্গ আছে — ব্যাহৃতি এবং শির (শিরঃ)। যেটিকে অতি যত্নে আহরণ করা হয়, তাহাকে ব্যাহৃতি বলা হয় অথবা যাহাকে খুব যত্ন সহকারে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকেও ব্যাহৃতি বলা হয়। ভগবদ্‌গীতায় ওঙ্কার উচ্চারণ প্রসঙ্গে একটি শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন - ''ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।'' এই প্রসঙ্গে আদি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন — প্রণবযুক্ত অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ সংযুক্ত ব্যাহৃতি যুক্ত এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীই সমস্ত বেদের সার। প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীর রূপ হইল — ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ, ওঁস্বঃ, ওঁমহঃ, ওঁজনঃ, ওঁতপঃ, ওঁসত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতি রসো'মৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরোম্ - এই সপ্তব্যাহৃতি গায়ত্রী মন্ত্রের একটি পূর্ণরূপ হইলেও গায়ত্রী জপের সময় প্রধানতঃ তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারিত হয়, যাহাদের 'মহাব্যাহৃতি' বলা হয়। জপকালে গায়ত্রী শিরের স্থলে শুধুমাত্র 'ওঁ', ওঙ্কারই ব্যবহৃত হয়। তিন মহাব্যাহৃতি এবং ওঙ্কারযুক্ত গায়ত্রীজপের সাধনা বহু প্রাচীন যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল এই বিষয় মনুসংহিতায় পাওয়া যায়।

গায়ত্রীর সপ্ত-ব্যাহৃতি আসলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তলোক, প্রত্যেক লোকই সগুণ ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহের বিভিন্ন প্রদেশ। এই লোকগুলি সেই সেই প্রদেশসুলভ জ্ঞানের বিকাশভূমি এবং আত্মজ্ঞানের ক্রমনির্দেশক। ভাগবত পুরাণমতে, এই সপ্তলোক ভগবানের সর্বব্যাপ্ত সমষ্টি দেহের সপ্তআবরণ। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী-শির ''ওঁ আপো জ্যোতি রসো'মৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোম্'' — এর অর্থ হল — 'আপঃ' অর্থে ব্যাপ্তি বুঝায়, 'জ্যোতি' অর্থে প্রকাশরূপ, 'রস' অর্থ সর্বাতিশায়িত্ব সর্বোৎকৃষ্টতা, 'অমৃত' অর্থাৎ মরণাদি সংস্কার বিমুক্ত এক বিশুদ্ধ বোধের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে গায়ত্রী শিরের অর্থ হল — সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকাশক, সর্বোৎকৃষ্ট, নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দ যে ওঙ্কার-বাচ্য ব্রহ্ম, সেটিই 'আমি' অর্থাৎ আমার আত্মসত্তা গায়ত্রীর শির গায়ত্রীর মুকুটমণি; অর্থাৎ, সাধনার ক্রমধারায় স্থূল অন্নময়কোষের অহংকারী জীব অপঃতত্ত্ব এবং তেজঃতত্ত্বের স্থূলাংশ নির্মিত মনোময় কোষে উত্তোলিত হইবার জন্যে প্রথমে প্রার্থনা জানায়। তারপর তেজঃতত্ত্বের সূক্ষ্মাংশ জ্যোতিঃতত্ত্ব-নির্মিত বিজ্ঞানময় কোষে উত্তোলিত হইয়া স্থিত হইবার জন্যে প্রার্থনা জানায়। অবশেষে তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর রসময় আনন্দময় কোষে উপনীত এবং স্থিত হইবার প্রার্থনা জানায়। ইহারও পরে সূক্ষ্মতম হিরণ্ময় কোষে অর্থাৎ যাহাকে দহর কোষ বলা হয়, সেই হৃদপদ্মের হিরণ্ময় দহর কোষে চিৎস্বরূপের অমৃতের মধ্যে স্থাপিত হইবার জন্যে যোগী প্রার্থনা জানায়। অন্তিমে এই ক্ষুদ্র 'আমি'র জীবরূপী বিন্দুকে ব্রহ্ম সিন্ধুতে মিলাইয়া জীব-ব্রহ্মের একাত্ম-করণ সাধিত হইবার জন্য সমর্পিত সত্তাবোধির প্রার্থনারূপ ব্যাকুলতায় জীব ব্রহ্মের 'একাত্মক' হইবার মন্ত্রই 'গায়ত্রী-শির'। মহাসাধক রামপ্রসাদের ভাষায়, ''সিন্ধুতে মা'র বিন্দুখানি ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক''— এই অবস্থা বা চিদ্‌ভূমির চেতনার সম্বোধি।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' -এর বঙ্গানুবাদ)

(২)

মুখবন্ধ — (মাতা দুর্গানন্দ) (...পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আত্মজ্ঞান লাভের পর পাঁচ বছর ধরে মুক্তানন্দ গণেশপুরী থেকে এক মাইল দূরে গাভদেবীতে নিত্যানন্দের তৈরী তিন কক্ষ বিশিষ্ট এক কুঁড়ে ঘরে নিত্যানন্দের সঙ্গে বাস করেন। তারপর ১৯৬১ সালে মুক্তানন্দকে সিদ্ধ ধারায় শক্তিপাত সঞ্চারিত করে নিত্যানন্দ দেহত্যাগ করেন। উত্তরাধিকারী হয়েও মুক্তানন্দের জীবনে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। গাভদেবীর তিন কক্ষ ঘরে তিনি বাস করতে লাগলেন। ১৯৬০ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভক্তরা রবিবার-রবিবার বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান থেকে এসে তাঁর কাছে সমবেত হতেন। এ ছাড়া আশ্রম সর্বদাই শান্ত ও নির্জন থাকতো। তখন মুক্তানন্দ কোন বক্তৃতা দিতেন না। যদি লোকেরা তাঁকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতো তখনই কেবল তিনি তার উত্তর দিতেন। তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই তিনি মৌন থাকতেন অথবা বড় জোর ঐ দিনের কোন খবর বা জল-আবহাওয়ার সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলতেন। তবুও যখন দর্শকরা তাঁর কাছে এসে বসতো, তারা অনুভব করতো যে তাঁর সান্নিধ্যে তাদের মন শান্ত হয়ে আসে, কোন রকম নির্দিষ্ট সঙ্কেত বা ব্যাখ্যা ছাড়াই তাদের মন ধ্যানের গভীরে ডুবে যেত। সেখানে তারা নানা রকম অন্তর আলো, গভীর প্রেমের বন্যার প্রাবল্য অথবা অন্তর দৃষ্টির দীপ্তিতে বাস্তবতার রূপ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করতো। ক্রমে, অন্যের উপলব্ধি লাভের কথা শুনে আশ্রমে আরও অনেক দর্শক তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগলো। সমস্ত শ্রেণী এবং জীবিকার লোকরাই সেখানে আসতে লাগলো। কিন্তু তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবি এবং বুদ্ধিজীবির সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। মুক্তানন্দের উপস্থিতিতে তাদের স্বাভাবিক সন্দেহের ঝোঁক উধাও হয়ে তারা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তো এবং এক অনাস্বাদিত শান্তি এবং শক্তি উপলব্ধি করতো। খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো যে তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেদের কিরূপ বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে - কেমন করে তাদের দুঃশ্চিন্তা দূর হল, কেমন করে তাদের বিশৃঙ্খল জীবনে শান্তি আসলো, কেমন করে যারা নিয়মিত ধূমপান এবং রঙীন পানীয় সেবন করতো তা পরিত্যাগ করেছে, কেমন করে তাদের পারিবারিক এবং ব্যবহারিক জীবন নুতন শক্তিতে নতুন পথে চালিত হল।

স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী মুক্তানন্দ

১৯৬০-এর শেষ ভাগে সমগ্র পৃথিবী থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলো, বর্তমান ভারতের অন্যতম দুর্লভ সদ্‌গুরু হিসাবে তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপের মুমুক্ষুরা তাঁর কাছে আসতে লাগলো। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের চাকুরী, পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আশ্রমে বাস করতে লাগলো। মুক্তানন্দ বোম্বাই, দিল্লীতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন এবং বিদেশী শিষ্যদের ক্রমান্বয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭০ সালে তিনি প্রথম পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেন।

পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ কালেই তাঁর বিশ্ববোধের অসাধারণ শিক্ষা স্পষ্ট হতে আরম্ভ করে যদিও তিনি অভারতীয় কোন ভাষায় কথা বলতেন না। তাঁর উপস্থিতি বিশ্বের সমগ্র দেশের হাজার হাজার লোকের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করতো এবং প্রমাণ করতো ভারতীয় ধারার শিক্ষা ক্যালিফোর্নিয়ার বৈজ্ঞানিক-এর ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য বোম্বাই-এর অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রযোজ্য; মিউনিখের হিসাব-রক্ষকের কাছে যতটা অর্থবহ মহারাষ্ট্রের চাষীর ক্ষেত্রেও ততটা অর্থবহ। পাশ্চাত্যের অধিবাসী ব্যক্তি যারা অন্তরে শান্তি পেতে আগ্রহী কিন্তু উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না এমন আধ্যাত্ম শিক্ষায় অতৃপ্ত, বিতশ্রদ্ধ তারাও ভারতীয় অধিবাসীদের মতন আবিষ্কার করলো যে মুক্তানন্দের উপদেশ শুধু মানসিক উন্নতি কারকই নয় প্রমাণ যোগ্যও বটে।

"প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর বিরাজমান"- এই বাক্য স্বল্পশক্তি সম্পন্ন গুরুর কাছ থেকে আসলে কেবলমাত্র এক আধ্যাত্মিক স্বতঃসিদ্ধ বাক্য বলে মনে হয়। যে সকল ব্যক্তি অন্তর-শক্তি শক্তিপাতের ক্রিয়াশীলতায় উদ্দীপিত হয়েছে তাদের কাছে ইহা বাস্তব সত্য বলে উপলব্ধিত হয়। ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশসমূহ বহু বছর পরিভ্রমণের ফলে ভারতে এবং বিদেশে মুক্তানন্দের বহু শত ধ্যানকেন্দ্র এবং অনেকগুলি আবাসিক আশ্রম গড়ে উঠেছে। ৭৫ একর জমিতে

বাগান, মন্দির, বাসগৃহ নিয়ে তাঁর গণেশপুরীর আশ্রম একটা বিশাল আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার লোক দর্শন করতে আসে। ভারতে ও পাশ্চাত্যে, তাঁর দ্রুতহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তের মধ্যে আছে শ্রমজীবি এবং বৃত্তিজীবি, যেমন—ডাক্তার, আইনজীবি, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক, সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং কিছু রাজনৈতিক ও সিনেমা শিল্পীও যাঁরা বুঝেছেন যে এই সিদ্ধ যোগের প্রক্রিয়া একবার অনুশীলন শুরু করলে, তা অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাদের জীবনের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, যা তাদের কর্মজীবন, বন্ধুবান্ধব এবং পারিবারিক জীবনেও বিধৃত।

'আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন থেকে কিছু আলাদা নয়, বরঞ্চ ইহা জীবনেরই অঙ্গ' - এই বোধ - এই-ই হল মুক্তানন্দের শিক্ষার ভিত্তি। তিনি বলেন, 'সিদ্ধযোগ, আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মের বাইরের কোন ব্যাপার নয়।' যে কথাটি তিনি তাঁর শিক্ষার ধারাকে বোঝাতে প্রায়ই বলে থাকেন তা হল —'স্বাভাবিক'। ঠিক যেমন দেহের বৃদ্ধি নিজে নিজেই হয়ে চলে, জোর করে বা তাড়াহুড়ো করে একে বাড়ানো যায় না। সিদ্ধযোগের অন্তর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ধীরে-ধীরে আত্মোপলব্ধির পথে অবশ্যম্ভাবীরূপে এগিয়ে নিয়ে যায়। শান্ত নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা, নিয়মিত ধ্যানের অভ্যাস ও মন্ত্রজপের দ্বারা এটিকে পালন করতে হয়। একবার জাগরিত শক্তি ক্রিয়া আরম্ভ করলে এই সব অনুশীলনগুলিও সহজ হয়ে আসে। সিদ্ধ যোগের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি কেবল শুধু আধ্যাত্ম অনুভূতিই উপলব্ধি করায় তা নয়, এটি একটি সুশৃঙ্খল আধ্যাত্ম জীবন যাপনের ইচ্ছাও সৃষ্টি করে। যারাই মুক্তানন্দের সংস্পর্শে এসেছে তাদের জীবনে আশ্চর্যজনক এক রূপান্তরের ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এমন লোক আছে যারা মাত্র কিছুদিন মুক্তানন্দের সঙ্গ করেছে, সেই সময় যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতো, তখন হঠাৎ জেগে উঠে ধ্যানের জন্য তীব্র বাসনা অনুভব করতো। আবার কিছু লোকের মধ্যে - যখন তারা দৈনন্দিন কাজকর্ম করছে বা রান্না করছে বা অফিসে কাজ করেছে, তাদের মনের মধ্যে মন্ত্র স্ফুরণের অনুভব করতো। কিন্তু সিদ্ধযোগের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য আধ্যাত্ম কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটানো নয়; আধ্যাত্মিক বোধের বিকাশ, আমাদের নিজের সঙ্গে আত্মার একত্ব অনুভব করা। মুক্তানন্দ এই বই-এ কি আলোচনা করেছেন, তিনি মন্ত্রের কিরকম ব্যাখ্যা করেছেন, অপ্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, অথবা ধ্যানকে কিভাবে জীবনের সঙ্গে মেলাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন সেটা বড় কথা নয়, আসল মূল যেটা যা তিনি দিয়েছেন সেটা হল একত্বর উপলব্ধি। এটি নিজেই, তিনি আমাদের বলেন, সকল প্রকার ভয়ের থেকে মুক্ত করে আমাদের একের সঙ্গে অন্যের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে জানায়, আমাদের জীবনের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলতে সাহায্য করতে পারে, অবশেষে আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পথে নিয়ে যায়। ''যখন তুমি তোমার সাধনার শেষে পৌছাবে তুমি উপলব্ধি করবে, সব কিছুই আত্মা।'' মুক্তানন্দ লিখেছেন, ''যখন এটাই ঘটনা, সেটা এখনই মনে রেখে এই সচেতনতা নিয়ে ধ্যান করো না কেন যে অন্তরে এবং বাইরে সবকিছুই যা তুমি দেখছ তাই আত্মা। কখনও কৌতুকের সঙ্গে, কখনও মিষ্টি কথায় কখনও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তিনি বার বার আমদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের প্রকৃত পরিচয় শরীরে বা মনে নয়, আত্মার সঙ্গে, যা অসীম সৃষ্টিশীল, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, অসীম আনন্দময় চৈতন্য যাহা সে জানে এবং আমাদের জানাবে যে আত্মাই হচ্ছে আমাদের মূল উপাদান ও ভিত্তিভূমি। কেবল যখনই আমরা সেই চৈতন্যকে বুঝতে পারি, তিনি আমাদের বলেন, সত্যকার মনুষ্যত্ব কি, তখনই আমরা বুঝতে পারি। কেবল যখন আমরা আমাদের অন্তরে এটিকে আবিষ্কার করতে পারি তখনই আমরা আমাদের জীবনের অর্থ বুঝতে পারি।

সেই আবিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় আসাই হল এই বই-এর মূল উপপাদ্য বিষয়। কোথায় তোমরা চলেছ? পুস্তকটি বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রশ্ন উত্তর, সাক্ষাৎকার, নিয়ে রচিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে রচিত হয়েছে যা আত্মজ্ঞান লাভের একটা মানচিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী মুক্তানন্দের মূল শিক্ষার একটা ভূমিকার রূপ নিয়েছে। এটি কেবলমাত্র সিদ্ধযোগের দর্শনকেই উপস্থিত করে তা নয়, এর প্রয়োজনীয় অনুশীলন দ্বারা সহজভাবে বুঝিয়ে দেয় যে প্রক্রিয়ার জন্যই অনুশীলন এই ভুল যেন না হয়, বরঞ্চ এটি একটি উপায় যার দ্বারা এটি আমাদের ইন্ধন যোগায় এবং এগিয়ে নিয়ে যায়, এই মনে করবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিভিন্ন পথের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, মূল বিষয়গুলিকে একত্রিত করে নতুন এক পথের সূচনা করে, আধ্যাত্ম পথের প্রথম অনুভূতি থেকে পূর্ণ মুক্তির স্তরে পৌছানো এবং আনন্দলাভ যা এর লক্ষ্য, সেই সবগুলি স্তরই এখানে আলোচিত হয়েছে।

...ক্রমশঃ

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৪)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের কথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছিলাম এবং বামন অবতারের ত্রিপাদ বিক্ষেপের পুরাণ কথা যেখান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছিলাম। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের জন্য পুরাণে তিনি ত্রিবিক্রম নামে স্তুত হয়েছেন। ঔর্ণবাভ বা যাস্ক যেভাবে এই রহস্যকে বুঝেছিলেন প্রায় সেই ভাবেই একালের যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিও বুঝেছেন। অথচ পুরাণকারেরা বেদের তত্ত্ব কথা বলতে গিয়ে দুধে এতটাই জল মিশিয়ে ছিলেন যে আসল তত্ত্বটা কোথাও কোথাও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। অথচ ব্যাসের বক্তব্য ছিল - 'পুরাণ পূর্ণচন্দ্রেন শ্রুতিজ্যোৎস্না প্রকাশিতা'।

সাধারণ আজকের যুগেও শাস্ত্রকথা মানে গল্প বোঝে। গল্পটা যে তত্ত্বের রূপক এটা বোঝে না। বামন অবতারের উপাখ্যান রামায়ণ, মহাভারত, বামনপুরাণ, ভাগবৎপুরাণ প্রভৃতি নানা স্থানে পাওয়া গেলেও কোথাও কোথাও কাহিনী বিন্যাসে তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। বামনপুরাণে বলির কাছে বামনের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনার কথা থাকলেও তিনটি পাদবিক্ষেপের কথা নেই।

পুরাণকথা অনুসারে ভগবান বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মান। ব্রহ্মা বামনের উপনয়ন সংস্কার করার পরে বামন বলিরাজের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। বামনের আগমনের কারণ অনুমান করতে পেরেছিলেন বলি রাজার গুরু শুক্রাচার্য। তিনি বলিকে উপদেশ দিলেন যে — তিনি যেন এই খর্বাকার বামনকে সামান্যতম জিনিসও না দেন। অথচ বামন উপস্থিত হবার পরে বলিরাজ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর অর্চনা করে তাঁকে দান করার প্রতিজ্ঞা করলেন। বামন তখন রাজাকে বললেন - "হে মহারাজ! অগ্নিরক্ষার জন্য আমাকে পদত্রয় ভূমি দান করুন।" বলি বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দিলে বামন তার বিশ্বব্যাপক বিরাটরূপ প্রকটিত করে লোকত্রয় জয় করে তা আবার ইন্দ্রকে দিলেন। বলিকে তিনি পৃথিবীর নিম্নতম দেশে সুতলে প্রেরণ করেছিলেন।

বামনপুরাণে ত্রিপাদ বিক্ষেপের কথা নেই কেবল তিনটি অগ্নি রক্ষার স্থানের কথা বলা হয়েছে। অথচ ভাগবৎ পুরাণে ত্রিপাদ বিক্ষেপের সুন্দর গল্প পাওয়া যায়। ভাগবতের গল্পে আখ্যানের নাটকীয় বিস্তার আছে এবং তাৎপর্য নাটকীয়তার মধ্যে নিহিত হয়েছে। এই আখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের খিল অংশ হরিবংশপুরাণের অনেক মিল। এই আখ্যানে সাক্ষাৎ যজ্ঞধর্মীতার কথা পাওয়া যায় না।

বামন পুরাণের আখ্যানে যজ্ঞধর্মীতা স্পষ্ট এবং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে বিষ্ণু ও বামনকে এক করার প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈদিক তত্ত্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি তিন অগ্নি হলেন - আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। পৃথিবীর যজ্ঞস্থলে যেমন প্রধান ভাবে এই তিন অগ্নির অবস্থান তেমনি পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ-লোক ও দ্যুলোকেও তিন নামে তিন অগ্নির অবস্থান। অগ্নি পৃথিবীতে পার্থিবাগ্নি রূপে বিরাজ করেন, দ্যুলোকে বৈদ্যুতাগ্নিরূপে এবং অন্তরীক্ষে সূর্যাগ্নিরূপে প্রকাশমান। এই তিন স্থানের অগ্নিরা আবার সূর্যেরই বিভূতি অর্থাৎ সেই এক সূর্যই স্থানত্রয়ে বিরাজিত। এই সূর্য বিষ্ণুকেই বেদে ব্রহ্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে -'অসৌ আদিত্য ব্রহ্ম' তাই বলছিলাম বামন অবতার ও ত্রিপাদভূমিতত্ত্ব সূর্যবিষ্ণু তত্ত্বেরই লৌকিক বা পৌরাণিক রূপক।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধেই বলেছি বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ তিন বা চার এই বিষয়ে একটা যে প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ জটিলতা ছিল না, কারণ উত্তরায়ণের বিষুববিন্দু ও দক্ষিণায়নের বিষুব-বিন্দুকে এক ধরলে চারের তিনের মধ্যেই গতার্থতা হয়। অথর্ববেদের মন্ত্রে (অথর্ব ১৯/১/৬/১-১৩) কিন্তু বিরাট পুরুষের অর্থাৎ সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু পুরুষের তিনটি পাদবিক্ষেপই ঘটেছে আকাশে এবং চতুর্থপাদে তিনি ভুবনব্যাপ্ত হয়েছেন। আকাশে ব্যাপ্ত তিনটি জ্যোতির্ময় পদকে এখানে অমরণধর্মা বলা হয় আর চতুর্থ পাদের দ্বারা ভুবন ব্যাপ্ত করার কথা বলা হয়। অথর্ব মন্ত্রটির বক্তব্য - তিন পদক্ষেপে তিনি আকাশে আরোহণ করেন, চতুষ্পাদে আবার তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই তিন পদের দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী (অশনা) এবং দেবতা ও বৃক্ষদের (অনশনা) লক্ষ্য করে বিশ্বব্যাপ্ত হন। আকাশের তিন স্থানে সূর্যের অবস্থান তিনপদ আর সূর্যকিরণ বা অগ্নিরূপে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে চতুর্থপদ।

বিষ্ণুর ত্রিপাদকে উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুববিন্দু হিসাবে ব্যাখ্যার ধারা কি রকম ছিল সে সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কিন্তু ত্রিপাদ যে সূর্যের আহ্নিক গতির তত্ত্বও হতে পারে এমন মতবাদও প্রচলিত আছে।

ডক্টর যোগিরাজ বসু তাঁর India in the Age of Brahmanas গ্রন্থে (১৯১ পৃঃ) বলেছেন — বামন হলেন মধ্যদিনের সূর্য। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে প্রতিদিন সূর্যের অবস্থান হল ত্রিপাদক্ষেপ। বিষ্ণুর মাঝের পা-টি ক্ষুদ্র কারণ সূর্য যখন মধ্যমাকাশে অবস্থান করেন তখন তাঁকে ক্ষুদ্র দেখায়। প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে সূর্য অপেক্ষাকৃত বড়। মধ্যমাকাশে অবস্থানই ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপ। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের সৎসঙ্গ

২০১৮ সালের জন্মাষ্টমীর পূর্বে পয়লা সেপ্টেম্বর, শনিবার, শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘরে বসে চা পান করতে করতে বললেন, “জান

তো হিরণ্যগর্ভ এখন প্রথম সারির আধ্যাত্মিক পত্রিকা হয়ে গেছে।” শ্রীশ্রীমা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুগভীর চিন্তা ও মনন দ্বারা পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য পরিচালনা করেন সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই পত্রিকাটিতে যেভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণের সুকর্ম ও তাঁদের আদি সত্তাটিকে উদ্ভাসিত করেন শ্রীশ্রীমা, সেটি সম্ভব একমাত্র অন্য আর একজন সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার পক্ষে। এই কারণেই পত্রিকাটি একদিকে মনোগ্রাহী, সুচিন্তিত ও সুললিত। শ্রীশ্রীমা বললেন, “গত ২৬ তারিখে (২৬/৮/১৮) যে সৎসঙ্গ করলাম, সেখানে কি বলব, পূর্বদিন পর্য্যন্ত ঠিক ছিল না; শেষে ভাবলাম যাক্ ভগবান মুখ দিয়ে যা নির্গত করাবেন তাই বলব। শুরু করলাম প্রেম দিয়ে, ‘বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা’ — এই কথাটা দিয়ে শুরু করলাম। দেখো সাধারণতঃ সাধনার কথা বলতে গেলে নীচ থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ওঠার কথা বলি কিন্তু সেদিন একেবারে প্রেম অর্থাৎ উত্তম উৎকর্ষতা থেকে সাধনার উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে যাওয়ার কথা বললাম, আর সেটা বলতে গেলে যেটা এসে পড়ে সেটা হোল ‘প্রেম’। ‘প্রেম’ আসে পরমবৈরাগ্য হতে; যখন মায়িক জগতের সমস্ত কিছু হতে মন বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু সেই পরমের প্রতি ধাবিত হয় এবং পরমকে পাবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে তীব্র হতে তীব্রতর হয় তখন হৃদয়ের প্রবল সংবেগে স্ফুরিত হয় প্রেম। দেখো, যিনি সেই পরাসম্বিতময় সৎচিৎ ‘যোগ’ অবস্থা হতে স্পন্দিত চৈতন্যশক্তি রূপী ব্রহ্মাণ্ডে জগৎ সৃষ্টি করলেন, তিনি একদিকে যেমন প্রকৃত ‘যোগ’ অবস্থা প্রদান করলেন তেমন অন্যদিকে তিনি বিয়োগও দিলেন। এই বিয়োগের মধ্যেও যোগ লুক্কায়িত আছে। বিয়োগ অবস্থা আছে বলেই যোগ আছে। মন বিয়োগে থাকতে থাকতে আকুলতায় সত্যের অনুসন্ধান দ্বারা চেতনার পথে অগ্রসর হতে চায় এবং সেই অবস্থায় সে গুরুর সন্ধান খুঁজে পায়। গুরু তাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে চালিত করেন অর্থাৎ সত্তা বিয়োগ থেকে যোগের পথে উন্নীত হোল। এবার সেই অন্তরের আলো তাকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন তাঁর নিজের আকর্ষণ শক্তিদ্বারা, কারণ তিনি সঙ্কর্ষণরূপী শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব। এই সঙ্কর্ষণরূপী কৃষ্ণশক্তি তখন চিত্তকে আত্মজ্যোতির দিকে ধাবিত করায়, যিনি আত্মস্বরূপে রাম অর্থাৎ আত্মারাম হয়ে স্থিত রয়েছেন প্রত্যেক জীবসত্তায়। বলরাম শক্তি বা আত্মগুরুশক্তি জীবসত্তায় কর্ষণ করেন অর্থাৎ সাধন কর্ষণ শক্তিরূপে বিরাজ করেন, তাই তাঁর হস্তে বিরাজ করে ‘হল’। কৃষ্ণরূপী সঙ্কর্ষণ শক্তি সত্তাকে আত্মজ্যোতির পানে আত্মায় আকর্ষিত করেন; বলরামরূপী কর্ষণ শক্তি সত্তাকে সাধনার পথে উত্তোলিত করেন উন্নত চেতনায়, তারপরে ধীরে ধীরে উত্তোলিত করেন আত্মজ্যোতিরূপ আলোক সাগরে যেখানে সত্তা আত্মারামকে লব্ধ হয়।

এই সবটাই ‘প্রেম’ বিনা হয় না। সত্তা মধ্যে পরা বৈরাগ্যের অনল প্রজ্জ্বলিত হলে তবেই প্রেম ও ভক্তি জাগ্রত হবে। সেই প্রেমই হোল সাধনার সর্ব-উৎকর্ষতার চরম প্রকাশ। আত্মারূপী রাম হলেন শান্ত স্থির অবস্থা। সেইজন্য দেখবে রামনাম করলে মন খুব শান্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যে ভরা, সর্বাঙ্গ সুন্দর তাঁর অবস্থিতি। তাঁর সেই মাধুর্য্য দিয়ে তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন। আত্মা-পরমাত্মার সাম্য হলেই তখন সত্তায় প্রেমের প্রস্রবণ নামে সেই দিব্য হতে।”

শ্রীশ্রীমা এত সুন্দর সহজভাবে একটি কঠিন বিষয়কে বোঝালেন, শুনে মনটা ভরে গেল, তাই যতটা ধরতে পেরেছি লিপিবদ্ধ করলাম।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী অদিতি মুখোপাধ্যায়

—জয় মা—

আশ্রম সংবাদ

১০ - ১৯শে অক্টোবর — আশ্রমের ২৭-তম নবরাত্রি ব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্য পূজা, যজ্ঞ ও ভোগ-প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচী অতি সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়। পঞ্চমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা পাঁচশতরও অধিক গ্রামবাসীকে বস্ত্রবিতরণ করেন। বস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া হয় মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট। সন্ধ্যায় মন্দিরে অপূর্ব এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয় এইদিন সন্ধ্যায়। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় নৃত্য প্রদর্শন করেন শিশু শিল্পী সমাদ্রিতা বসু, বিদিশা সাহা ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্ত। এরপর শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণ। মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। অগণিত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহরে অগণিত ভক্তজন মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর মহাপ্রসাদ বিরতণ করা হয়।

২৪শে অক্টোবর — শ্রীশ্রীকোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শ্রীযজ্ঞনারায়ণদার পৌরহিত্যে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর আরাধনা ও যজ্ঞ।

৪ঠা নভেম্বর — এইদিন সকালে শ্রীশ্রীমা বস্ত্রাদি বিতরণ করেন অগণিত দুঃস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে। বস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেককে একটি করে মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হয়।

৬ই নভেম্বর — দীপাবলীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন রঙের বাতির আলোকে ও রঙ্গোলিতে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল আশ্রম। অমানিশার মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমা নিজে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেবী তারাকালিকার পূজা করেন।

১৭ই নভেম্বর — এইদিন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ নিবেদিত হয়।

২৩শে নভেম্বর — রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ হয় দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় অপূর্ব ভজন পরিবেশন করেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা।

২৫শে নভেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন বহু দুস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে। এইদিন সন্ধ্যায় অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

১লা-৮ই ডিসেম্বর — এইকয়দিন শ্রীশ্রীমা বারাণসীর আশ্রমে অতিবাহিত করেন। বারাণসী অবস্থানকালে একদিন শ্রীশ্রীমা নৈমিষারণ্যে গিয়েছিলেন।

১৫ই - ১৬ই ডিসেম্বর — ১৫ই ডিসেম্বর অষ্টমী তিথির প্রভাতে ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে

শিশুদের প্রসাদ পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় এক সুন্দর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউদেবের পূজার্চ্চনা ও প্রসাদ বিতরিত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ২৯তম পর্বে কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

২৮শে ডিসেম্বর — শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে এইদিন আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম হয়। শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে হোটরের 'মহিলা ও শিশু' আশ্রমের মেয়েরা। আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ একটি শ্রুতিমধুর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। হোটর আশ্রমের শিশুশিল্পীরা একটি মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ প্রদান করে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, শ্রীঅভয়-কন্যা পরিপূর্ণা দেবী অপূর্ব অভয়-গান পরিবেশন করেন।

৩০শে ডিসেম্বর — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগ ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উপর প্রবচন দেন।

विष्णु अवतार दत्तात्रेय भगवान

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

ब्रह्मा के मानसपुत्र महर्षि अत्रि के अन्यतम तनय थे 'दत्त'। दत्त की माता थी अनसूया देवी। वे अतिशय साध्वी थी। महर्षि अत्रि ने पुत्र की इच्छा से वैकुंठाधिपति नारायण की उपासना की, उनकी उपासना से सन्तुष्ट होकर श्रीभगवान नारायण ने दर्शन देकर उसे कहा, ''मैं पुत्ररूप में तुम्हारा दत्त हुआ''। इसीलिए अत्रि महर्षि के पुत्र 'दत्तात्रेय' नाम से ख्यात हुए। दत्तात्रेय विष्णु के छठे अवतार थे। उनकी माता अनसूया देवी सतीयों में श्रेष्ठ थी।

महर्षि अत्रि की स्त्री अनसूया देवी के सतीत्व की परीक्षा करने के लिए एकबार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अत्रि आश्रम में आये। त्रिदेव साधु ब्राह्मण के वेश में थे। देवी अनसूया जब पाद्य अर्घ्य एवं आचमन करने आयी तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया एवं जिद्द किया कि अनसूया देवी अपने शिशु पुत्र के सदृश उनके साथ आचरण करे, यह सम्भव होने पर ही वे पाद्य-अर्घ्य स्वीकार करेंगे। तपोतेजोमयी सती उनके कपट को समझ गई एवं तब उन्होंने त्रिदेव के शरीर पर निज स्वामी के पादोदक छिड़ककर कहा, 'बाल भव'; तत्क्षणात् त्रिदेव छः महीने के शिशुओं में परिणत हो गये। तब देवी अनसूया अपनी क्रोड़ में लेकर उन्हें स्तनपान कराने लगी। अनसूया के इस अद्‌भुत अपूर्व महिमा से त्रिदेव ने मुग्ध होकर वर देना चाहा इस पर देवी अनसूया ने त्रिदेव को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। इसप्रकार ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महेश्वर के अंश से दुर्वासा ने जन्म ग्रहण किया। अग्रहायण पूर्णिमा को दत्तात्रेय का जन्म हुआ।

शैशव से ही दत्तात्रेय तपस्या में मग्न रहते थे। योगशास्त्रवेत्ता के रूप में दत्तात्रेय की ख्याति चहुँ ओर फैल गई। भारत के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण पर्यन्त उनके तीर्थ देखे जाते हैं। दत्तात्रेय ने अनेक मुनियों, ऋषियों, सुरों तथा असुरों को आत्मविद्या की शिक्षा प्रदान की, उनमें प्रमुख हैं सहस्रार्जुन, अलर्क, प्रह्लाद, भार्गव, परशुराम, यदु और हैहयराज कार्तवीर्यार्जुन। कार्तवीर्यार्जुन ने दत्तात्रेय ऋषि के कल्याण से चार विशेष वर प्राप्त किए। इस वरदान के प्रभाव से उन्होंने युद्धक्षेत्र में सहस्र बाहुधारीरूप एवं अन्य समय में द्विबाहु होने की क्षमता प्राप्त की, एक ही साथ समग्र पृथ्वी को जय करने की शक्तिलाभ करने का वर प्राप्त किया। उनका तृतीय वर था धर्मराज्य की स्थापना और प्रतिपालन का वर, इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्धत ना होने के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। दत्तात्रेय के वरदान से कार्तवीर्यार्जुन, पृथु, नहुष प्रमुख श्रेष्ठ राजन्यवर्ग के समतुल्य होकर महाभारत के वनपर्व में कथित हुए। नृपति नहुष ने दत्तात्रेय की कृपा से जन्मग्रहण किया।

दत्तात्रेय भगवान

विष्णु ने दत्तात्रेय अवतार रूप में यज्ञ क्रिया सहित समस्त वेदों का प्रत्यानयन किया। महर्षि दत्तात्रेय ने 'अवधूत गीता' का प्रणयन किया। भगवान विष्णु के अंशावतार होने के फलस्वरूप वे जन्म से ही सिद्ध थे। उनकी सत्ता के भीतर सत्त्वगुणों की ग्राह्य शक्ति इतनी तीव्र थी कि सृष्टि के अणु-परमाणु में वे कोई ना कोई शुद्धगुण खोज लेते थे।

दत्तात्रेय के मध्य गुरु बिना ही ज्ञानालोक प्रकाशित हुआ था। दत्तात्रेय ने घोषणा की थी कि उन्हें आत्मचेतना का अनुभव हो गया है, वे स्वयं ही अपने गुरु हो जाते है। भगवत्सत्ता के क्षेत्र में यह सम्भव है, अन्य के संबंध में नहीं है। भगवत्सत्ता को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती। परमब्रह्म के प्रतिभू होने के कारण उनके मध्य ज्ञान स्वतः सिद्ध होता है। महर्षि अत्रि के तीन पुत्रों के मध्य दत्तात्रेय बाल्यकाल से ही ज्ञान और वैराग्य सम्पन्न थे। जब वे वयस्क हुए तब चरम परा-वैराग्य होने के कारण ये कभी वनों-जंगलों तो कभी पर्वतों पर विचरण करने लगे। कभी शून्य देवालयों में जाकर वे ध्यानावस्थित रहते। एकदिन दत्तात्रेय अपने मन और भाव में मग्नानन्द में

विभोर होकर हाथी के सदृश चले जा रहे थे।

उन्हें इस प्रकार विभोर एवं परमानन्द में लीन देखकर एक राजा ने उन्हें जिज्ञासा किया कि, ''आपको ऐसी कौनसी वस्तु प्राप्त हुई है कि जिस कारण से आप इतने विभोर एवं आनन्दमय रहते हैं?'' (अर्थात्, ऐसा आनन्द आपने किस गुरु से प्राप्त किया?) राजा के इस प्रश्न को सुनकर भगवान दत्तात्रेय ने कहा, –''सर्वजनों की गुरु तो अपनी आत्मा ही होती है कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमान स्वरूप अपने आत्मज्ञान से ही सर्वजन कल्याण को प्राप्त होते है।'' दत्तात्रेय ने पुन: कहा,''हे राजन्! मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया, मैंने किसी से भी कान में फुँक देकर कोई मंत्र नहीं लिया। किन्तु जिसके जिसके मध्य जो-जो सद्‌गुण मेरी बुद्धिदीप्त दृष्टि के दृष्टिगोचर हुए, उन-उन गुणों को ही मैंने अपने स्वभाव में धारण किया है, इस कारण से वे समस्त ही मेरे गुरु हैं। इस प्रकार २४ जनों से आपने जो-जो २४ गुण प्राप्त किए हैं उनके नाम कृपया आप मुझे बताइए तथा उनसे आपने कौन से गुण ग्रहण किए है उस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए जिसे मुझे भी सम्यक ज्ञान लाभ हो।'' दत्तात्रेय ने तब राजा को जिज्ञासु जानकर कहा, ''हे राजन्! तुम एकाग्र होकर श्रवण करो सर्वप्रथम मैं उन २४ गुरुवरों के नाम बोलूँगा एवं तत्पश्चात् उनके गुण विषयों का वर्णन करूँगा। मेरे २४ गुरु हुए – (१)पृथ्वी (२)जल (३)अग्नि (४)वायु (५)आकाश (६)चन्द्रमा (७)सूर्य (८)कपोत (९)अजगर (१०)सिन्धु (११)पतंग (१२)भ्रमर (१३)मधुमक्खी (१४)गज (१५)मृग (१६)मीन (१७)पिंगला (१८)कुरर पक्षी (क्रौंच) (१९)बालक (२०)कुमारी (२१)सर्प (२२)शरकृत् (२३)मकड़ी (२४)भृंगी (स्त्री भ्रमर)।

इन २४ गुरुओं से मैंने एक-एक गुण ग्रहण किया है वे गुण इस प्रकार है : (१)पृथ्वी – दत्तात्रेय ने कहा कि क्षमा एवं परोपकार इन दोनों गुणों को मैंने पृथ्वी से ही प्राप्त किए है। (२) जल – जल से उन्होंने स्वच्छता और माधुर्य स्वभाव को पाया है। (३) अग्नि – मनुष्य की जिसकी जितनी क्षमता उतना ही ग्रहण करना चाहिए जैसे अग्नि का अपना उदर ही पात्र है; उस पात्र में उसकी जितनी क्षमता उतना ही वे संचय करती है। उससे अधिक संग्रह का प्रयोजन नहीं है। (४) वायु – जैसे वायु निरन्तर चलती बहती है किन्तु किसी पदार्थ से आसक्त नहीं होती। मनुष्य के लिए भी यह व्यवहार ही पाथेय है या करणीय है। अधिक भोगेच्छा नहीं करनी चाहिए। (५)आकाश – जैसे आकाश में सूर्य, चन्द्र तारागण, वायु आदि रहते हैं किन्तु आकाश की किसी वस्तु के साथ भी इन समस्त का संबंध नहीं रहता, आकाश सर्वदा असंग रहता है। आकाश व्यापक एवं असंग जैसे सत्ता में आत्मा असंग एवं व्यापक। देह के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है एवं संसार में रहने पर भी आत्मा किसी से भी लिप्त नहीं होती। इसीलिए दत्तात्रेय ऋषि ने उन्हें अपना गुरु माना। (६) चन्द्रमा – दत्तात्रेय ने राजा से कहा, ''जैसे चन्द्रमा सर्वकालों में एकरस रहता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, वह पूर्ण ही रहता है किन्तु पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका ह्रास और वृद्धि समझी जाती है। किन्तु उसके स्वरूप में कभी भी ह्रास और वृद्धि नहीं होती ठीक वैसे ही आत्मा भी पूर्ण रहती है। आत्मा की ह्रास और वृद्धि नहीं है, वह चन्द्रमा के सदृश सर्वकाल में एकरस है। (७) दत्तात्रेय के सप्तम गुरु है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी के तलदेश से जल को खींचता हैं फिर समयानुसार उसका परित्याग भी कर देता है उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी निज इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण कर फिर उनका त्याग करना पड़ता है। (८) कपोत – दत्तात्रेय के अष्टम गुरु हैं कपोत। स्नेह मनुष्य के मृत्यु का कारण बन जाता है यही कारण मनुष्य को स्नेह का त्याग करना होगा। एकबार दत्तात्रेय ने देखा, वन के मध्य एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत एवं कपोतिनी रहते थे। उस वृक्ष पर ही उन्होंने घोंसला बनाया तथा कुछ समय के पश्चात् कपोतिनी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। जब वह कपोत शिशु कुछ बड़े हुए तो वृक्ष के नीचे उतरकर खेलने लगे। एक दिन वहाँ व्याध आया; कपोत शिशुओं को खेलते हुए देखकर उसने जाल बिछाया और उन्हें पकड़ लिया; यह देखकर कपोतिनी ने सोचा 'जिसके सन्तान-सन्तति की मृत्यु हो जाती है उसका मरना ही अच्छा है।' यह सोचते हुए कपोतिनी उस जाल के मध्य स्वेच्छा से गिर गयी एवं व्याध ने उसे भी अपनी गिरपत में ले लिया। यह सब देखते हुए स्नेह के वशीभूत होकर कपोत ने भी कपोतिनी की गति प्राप्त की। स्नेह वशत: व्याध के हाथों से समस्त जनों की मृत्यु हो गई।'' यह कहानी विवृत कर दत्तात्रेय ने राजा से कहा, ''मनुष्य के

जन्म और मरण का कारण ही है स्नेह। यही कारण है कि वीतरागी मनुष्य को स्नेह को त्याग करना होगा, यही है मोक्ष का साधन।'' (९) अजगर – जैसे अजगर एकस्थान पर एक ही भाव में पड़ा रहता है एवं अपने भोजन के लिए भी यत्नवान नहीं होता, जो कुछ भी दैवयोग से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, उससे अधिक इच्छा कभी नहीं करती, संग्रह भी नहीं करता। उसी प्रकार सन्यासी को भी ईश्वर में विश्वास स्थापन कर जो कुछ प्राप्ति होती है उसी में सन्तुष्ट रहना होगा। (१०) सिन्धु – जैसे समुद्र में अनेक नद-नदियों का जल आकर सम्मिलित होने पर भी समुद्र चलायमान नहीं होता, सिन्धु कभी भी अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता उसी प्रकार सन्यासी का मन भी अनेक भोग्य विषयों को सम्मुख देखने पर भी चंचल नहीं होता। जो प्रकृत सन्यासी होते है वे सर्वदा अपनी मर्यादा में अटल रहते है। सिन्धु का यही महान गुण दत्तात्रेय ने ग्रहण किया था। इसके बाद दत्तात्रेय ने राजा से कहा,''हे राजन्! (११) पतंगा (१२) भ्रमर (१३) मधुमक्खी (१४) गज (१५) मृग एवं (१६) मीन ने सभी इन्द्रियज ग्राह्य विषयों के प्रति आसक्त होकर अपने-अपने प्राणों से हाथ धो बैठते है या प्राणों का विसर्जन दे देते हैं। इसी कारणवश मनुष्य को इन्द्रियादि द्वारा ग्राह्य विषयों के प्रति आसक्त ना होकर इन सब के प्रति वैराग्यधारण कर अपनी दुर्गति से त्राणलाभ करना होगा। जैसे पतंगा दीपक से मोहित हो कर अग्नि में प्राण विसर्जन कर देता है वैसे ही पुरुष यदि स्त्री के रूप पर मोहित एवं आकर्षित हो जाता है तो उसका मुक्ति का पथ रुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार भ्रमर कमल की गंध से प्रभावित होकर कमल में ही बद्ध हो जाता है वैसे ही वासना के कारण मनुष्य स्वयं ही संसार में लिप्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप मुक्ति का पथ रुद्ध हो जाता है। जैसे मधुमक्खी कठिन श्रम द्वारा अपने घर का निर्माण कर उसमें मधु का संचय करती रहती है किन्तु स्वयं उसका लाभ उठा नहीं पाती, अन्य जन उसका लाभ उठाते है एवं मधु संग्रह उसके मृत्यु का कारण बनता है। उसी प्रकार सन्यासी को भी संग्रह की वृत्ति से दूर रहना वांछनीय है।'' इस प्रकार जीवों के स्वभाव के उदाहरण के माध्यम से दत्तात्रेय भगवान ने राजा को मोक्ष प्राप्ति का उपदेश प्रदान किए।

अब दत्तात्रेय ने अपने (१७) वे गुरु पिंगला का कथा राजा को सुनाई। उन्होंने कहा, ''हे राजन्! निराशा के गुण को मैंने एक वैश्या से सीखा है। एक जगह में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। वह अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार कर खिड़की से देखती थी। एकदिन उस के निकट जब कोई ग्राहक नहीं आया तो वह अशान्त हृदय से निराश होकर अपने कर्म के प्रति आत्मग्लानि से भर उठी। ठीक इसी प्रकार संसारी मनुष्य अपने इप्सित भोग्य सामग्री प्राप्त ना होने पर निराश होकर 'भोग से सुख नहीं होता' ऐसा बोध कर आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होने लगता है, तब उसे सच्चे सुख का संधान मिलता है। (१८) कुरर पक्षी – उस पक्षी से दत्तात्रेय ने भोग त्याग से सुख प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त की। (१९) बालक – दूध पीकर बालक चिन्तारहित होकर जैसे सो जाता है, ठीक वैसे ही भिक्षा से जो कुछ प्राप्त होता है उसे खाकर सर्वप्रकार की चिन्ताओं से मुक्त होकर सन्यासी चैन की नींद सोता है। चिन्ता रहित रहने का गुण दत्तात्रेय ने बालक से प्राप्त किया था। (२०)कुमारी – अकेला नि:संग रहने के गुण की दत्तात्रेय ने एक कुमारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की। ध्यान-सिद्ध होने के लिए सन्यासियों को सर्वदा अकेला अवस्थान करना उचित है। (२१) सर्प – जैसे सर्प अपना घर (बिल) निर्मित नहीं करता, प्रकृतिज घर में ही निवास करता है उसी प्रकार सन्यासियों को भी निज आलय तैयार करना उचित नहीं है जिसे कि घर के प्रति उसका मोह ना जन्म ले पाये। वे सार्वजनिक मंदिरों, देवालयों एवं गुफा में निवास करते है। (२२) शरकृत – मन को एकाग्र करने की शिक्षा दत्तात्रेय ने एक शरकृत अर्थात् बाण निर्माता से प्राप्त की। बाण को सीधा कर निर्माण करने एवं लक्ष्यभेद करने में जो एकाग्रता का प्रयोजन होता है उसी प्रकार की एकाग्रता प्रत्येक योगी हेतु प्रयोजनीय है। ब्रह्मविद्या साधनकाल में ध्यान-योग में योगी को एकाग्रता का अवलम्बन करना पड़ता है। (२३) जिस प्रकार मकड़ी अपनी लार निर्गत कर जाल बुनती है और उसी जाल में आबद्ध हो जाती है ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने संकल्पों विकल्पों से निर्मित इस जगत् में स्वयं ही आबद्ध हो पड़ता है।'' संकल्प विकल्प के त्याग का गुण दत्तात्रेय ने मकड़ी से लिया था। (२४) भृंगी – दत्तात्रेय ने राजा से कहा, उनका २४ वाँ गुरु है एक भृंगी। भृंगी ऐसा एक जीव है जो किसी भी कीट को पकड़कर अपने घर के भीतर रखने में सक्षम होता है एवं उसे अपने

सम्मुख रख शब्द उत्पन्न करता रहता है। वह कीट निरंतर भृंगी का शब्द सुनते-सुनते भृंगीरूप हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पुन: पुन: शरीर का चिन्तन करते-करते अपने शरीर विषयों को समझता है, लेकिन उसे जब होश आता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है तब वह देह का मोह परित्याग कर आत्मरूप में स्थित होता है।

इसके पश्चात् दत्तात्रेय भगवान ने राजा से कहा -''इन २४ गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध प्रदान किया है जिसे मैं निज स्वरूप आत्मा में स्थित होकर जीवन्मुक्त हो गया हूँ। अभी मैं परमानन्द में स्थित हूँ अतएव मैं समस्त चिन्ता से मुक्त होकर विचरण करता रहता हूँ।'' भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेशों को श्रवण कर वह राजा भी संसार-मोह त्याग कर आत्मानन्द में विभोर हो गये। दत्तात्रेय सदृश जीवन्मुक्त महाज्ञानी के चरणों का जहाँ स्पर्श हुआ वह स्थान ही पवित्र तीर्थ बन गया। दत्तात्रेय ने परिभ्रमण में ही अपना अत्यधिक जीवनयापन किया। वे जहाँ चातुर्मास में रूकते वह स्थल तीर्थ हो जाता। गिरनार पर्वत, नासिक से कुछ ही दूरी पर गोदावरी तट, अरावली पर्वत पर, नर्मदा के किनारे, श्रीनगर से कुछ दूरी के पर्वतों पर, हिमालय इत्यादि अनेक स्थानों पर दत्तात्रेय भगवान की तपोस्थली आज महान तीर्थों में परिगणित है।

दत्तात्रेय भगवान की 'अवधूत गीता' अद्वैत दर्शन की एक सर्व श्रेष्ठ रचना है। अवधूत गीता में उन्होंने घोषणा की थी 'एकमेवाद्वितीयम्' इसकी अनुभूति एकमात्र आत्मज्ञानी के पक्ष में ही होनी सम्भव है। आत्मा का अस्तित्व ही सर्वस्व एवं सर्वव्यापक है। एकमात्र आत्मा की ही सत्ता विद्यमान है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। यही कारण है कि जितने द्वन्द्व हम देखते हैं सब आत्मा से अनभिज्ञता के कारण प्रतीत होते है। 'इन सभी का कारण मन है' ये द्वन्द्व भ्रान्तिमात्र है। दत्तात्रेय ने जीवन्मुक्त ज्ञानी को 'अवधूत' कहा है। 'अवधूत' शब्द चार अक्षरों द्वारा गठित है। अ + व + धू + त = अवधूत; इस क्षेत्र में 'अ' अक्षर 'आशारूपी पाश से मुक्त अवस्था', 'आदि, मध्य एवं अन्त जिसका निर्मल', 'आनन्द' में नित्य जो मग्न हैं, यह अ-कार हुआ अवधूत का लक्षण। 'व' अक्षर 'जिन्होंने वासना का त्याग किया है' एवं वक्तव्य जिनका राग रहित है, जो सर्वदा 'वर्तमान' अवस्था में रहते हैं, वह व-कार अवधूत का लक्षण है। अवधूत शब्द में 'धू' अक्षर का ऋषि दत्तात्रेय यह अर्थ किया है कि 'धूलि धूसर जिनका अंग', अर्थात्, जो विलासिता एवं शृंगार रहित है, 'धौत है जिनका चित्त' अर्थात् जो निर्मल चित्त सम्पन्न है एवं 'धारणा एवं ध्यान' द्वारा जो मुक्त हो गये हैं, ये तीन 'धू-कार' अवधूत के लक्षण होते है। अवधूत शब्द में त-कार का अर्थ हुआ, 'जो तत्त्व चिन्ता को धारण करने में सक्षम है,' जिन्हें चिन्ता एवं चेष्टा से रहित अवस्था प्राप्त हुई है, 'तमोरूपी अहंकार से जो रहित हो जाते है, ये तीन 'न-कार' अवधूत के लक्षण माने जाते है।

'अघोर' पशुपति महादेव रुद्र का शरीर यजुर्वेद, अथर्व वेद, श्वेताश्वेतर उपनिषद् में अर्थात् वैदिक युग से ही शिव के मंगलमय अघोर मूर्ति का वर्णना मिलता है। अघोर पन्थयोग के धारा में ऊघड़, अघोर तथा अवधूत, इन तीन शब्दों का प्रयोग प्रचलित है। अघोर या अवधूत ऊघड़ की परम्परा अति प्राचीन है। अघोर-योगसिद्ध महात्मा बाबा गुलाबचन्द आनन्द ने अघोर पंथ का परिचय देते हुए कहा -'अघोर या अवधूत मत कोई नवीन मत नहीं है। शिवजी महाराज के पंचमुख के एक मुख को अघोर कहा जाता है। यह लिंग पुराण में सिद्ध हुआ है। उपनिषद्, रुद्री एवं शिवगायत्री से इनका महत्त्व प्रकट हुआ है। जगद्‌गुरु दत्तात्रेय भगवान ने भी इस मत का प्रचार किया था।' पुराण में कथित है कि प्रभु दत्तात्रेय ने अनके हजार वर्षपूर्व पृथ्वी को अष्टांग योग ज्ञान प्रदान किया था। पतंजलिदेव ने इस अष्टांग योगज्ञान को सूत्रों के रूप में ग्रथित किया।

सहायक ग्रंथ - मार्कण्डेय पुराण, भागवत,
कूर्मपुराण, जावालदर्शन उपनिषद्

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

– ॐ नम: शिवाय –

विज्ञप्ति :– जून २००८ से अक्टूबर २०१४ तक की हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्त्ती संख्याएँ तथा २००७-२००८ तक की भर्गज्योति पत्रिकाओं की तीन संख्याएँ आश्रम में उपलब्ध हैं। मूल्य - रूपये ५३५/- (डाक-सेवा खर्च अतिरिक्त)-

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२१)

गुरुणा दर्शिते मार्गे मनः शुद्धिंच कारयेत्।
अनित्यं खंडयेत् सर्व्वं यत्किंचिदात्मगोचरम्।।६६

गुरुणा (सद्गुरुणा) दर्शिते मार्गे (गतिं लब्धा) मनःशुद्धिं (मनसः शुद्धिं) च कारयेत्; (एवं कृत्वा जगत् सम्बन्धि) यत्किंचित् अनित्यं आत्मगोचरं (अस्ति), तत् सर्व्वं खंडयेत्।।६६

परन्तु जीव आकार विशिष्ट है, अतएव निराकार को नहीं समझते है एवं वह भाव समन्वित होने के कारण भावातीत-

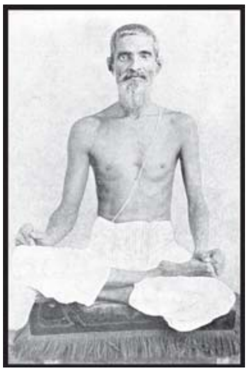

भाव को भी नहीं समझ पाते है इस कारण इन्द्रियों के मध्य पतित अन्ध जीवों की शून्यस्वरूप ब्रह्मधारणा नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि इन्द्रिय मध्य से सद्गुरु प्रदर्शित मार्ग द्वारा ही जीव-सत्ता को गति करनी होगी; जड़मूर्ति को क्रमशः सूक्ष्ममूर्ति, तत्पश्चात् सूक्ष्माणु मूर्ति में परिणत करना पड़ता है, यह ही मनःशुद्धि के उपाय है, अर्थात् मन के आवरण स्वरूप जो इन्द्रियविषय रूपी मल मन को आवरित कर उसे अन्धा बना रखे हैं, वह निवारित होकर मन स्वच्छता प्राप्त होने पर ब्रह्मदर्शन होता है, तब मन के गोचरीभूत जो समस्त अनित्यज्ञान है (अर्थात् अनित्य का नित्यबोध से जो मिथ्याज्ञान) वह दूरीभूत हो जाता है, अर्थात् क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था को प्राप्त करोगे; क्रिया की परावस्था ही ब्रह्म का रूप हैं एवं उस अवस्था को लाभ करने से ही ब्रह्मलाभ होता है।।६६

ज्ञेयं सर्व्वमनित्यंच ज्ञानंच मन उच्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्य्यान्नान्योहप्यात्मद्वितीयकः।।६७

ज्ञेयं (यत् नित्यमिव प्रतीयते) (तत्) सर्व्वं अनित्यंच (अनित्यमेव जानीयात्), (द्वितीयं किंचित् नास्ति अतएव) मनः (एव) ज्ञानम् (ज्ञानस्वरूपं) उच्यते, (अतएव) ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्य्यात्; अन्यः (काश्चित्) अपि आत्मद्वितीयकः न (अस्ति इति शेषः)।।६७

ब्रह्म के अलावा दूसरा जो समस्त ज्ञेय अर्थात् जानने का विषय है ऐसा अनुमान होता है, वे समस्त ही काल्पनिक होने के कारण अनित्य है अर्थात् उनसब के ज्ञान से नित्यज्ञान नहीं होता। मन ही ज्ञान-स्वरूप है, इसके वाह्य संस्कार को मिटाकर उसको निर्मल करना होगा, तब देखोगे कि ज्ञान व ज्ञेय दोनों ही एक हो गये हैं; अर्थात् जब एक हुए तब द्वितीय कुछ नहीं रहता, इसीलिए क्या जानोगे एवं किसको जानना चाहते हो? अतएव जानना एवं जानने का विषय भी नहीं रहता; अतएव ब्रह्म को 'मैं और तुम' सम्बोधन के द्वारा जो परभाव में देखना, यह भी यथायथ नहीं है; मन निष्कल भावापन्न होने से वही ब्रह्मभाव या मन के आत्मभाव है; परभाव में दर्शन वह ही मन का कल्पनारूपी कलंक है, अतएव मन ही आत्मा है एवं मन के अतीत आत्मीय कहने का द्वितीय और कुछ नहीं है।

एवं श्रुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोति यः।
स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्र दिवाकरौ।।६८

हे महादेवि! एवं श्रुत्वा (पूर्व्वकथितं गुरुमाहात्म्यं श्रुत्वा) यः (जनः) गुरुनिन्दां करोति सः यावच्चन्द्र दिवाकरौ घोरं नरकं याति।।६८

हे महादेवि, ऐसी गुरुमहिमा सुनकर भी जो जन गुरुनिन्दा करता है, वह घोर नरक में यावच्चन्द्र दिवाकर पतित रहता है।।६८

सूर्य ताप एवं आलोकदान पूर्वक जगत् की रक्षा कर रहा है, नचेत् अन्धकारमय व शैत्यगुण विशिष्ट जगत् ताप एवं आलोक के अभाव से रह नहीं सकता। सूर्यताप सहन न कर सकने पर समुद्र मंथन में रसगुण विशिष्ट चन्द्र की उत्पत्ति होकर वह आकाश पर स्थितिप्राप्त हुए (गीता १५ अः, १३ श्लोक देखो)। सूर्य ताप दान करते हैं एवं रसात्मक चन्द्र रसगुण वितरण करते हैं; इस उभयविध गुण के द्वारा जगत् का साम्यभाव रक्षण हो रहा है। परन्तु इस चन्द्र का भी अन्त है एवं सूर्य का भी अन्त है – ये भी कालान्तर में महाकाल-मध्य लयप्राप्त हो जाएंगे। जगत् के रक्षकद्वय सूर्य-चन्द्र के रक्षणाभाव हेतु जगत् का भी विलोप हो जाएगा, जगत् भी

महाकाल में लयप्राप्त हो जाएगा – यह ही महाप्रलय है। इस कारण मूल श्लोक में कहा गया है कि जबतक यह महाप्रलय नहीं आता है। तबतक गुरुद्रोही जीव को सूर्य-चन्द्र के कृपा वर्जित होकर नरक में पतितावस्था में रहना पड़ता है। इस देह को ही क्षुद्र जगत् कहा जाता है, जीव मन-आकार में इस देह-मध्य निवास कर रहा है एवं चन्द्राकार में इसके ऊर्ध्व पर गति होकर सूर्य के निकट से बुद्धि स्वरूप प्रभा संग्रह करके निम्नजगत् को वह आलोकित कर रहा है। जगत् से चन्द्र की उत्पत्ति है इसलिए जगत् के संस्काररूपी रसगुण उस में रहते हैं एवं इस रसगुण के द्वारा वह सूर्य के ताप को प्रशमित कर रहा है; नचेत् प्रखर सूर्यताप से जगत् निज उद्‌भवस्थल सूर्य में जाकर मिश्रित हो जाता एवं जगत् का लय हो जाता। परन्तु रस धातु के आधिक्य होने पर (अर्थात् मन इन्द्रियादि द्वारा अभिभूत रहने से) चन्द्र, तारा सूर्यलोक से विच्छिन्न होकर निम्न जगत् में गिर पड़ते हैं अर्थात् मन बुद्धि भ्रष्ट होकर अध:पतित हो जाता है – (गीता २य अ: ६३ श्लोक देखो) एवं जीव की अन्धकारमय पाताल में गति होती है। पाताल में नरक की स्थिति है, वहाँ जाकर मृत्यु यंत्रणारूप बहुविध यंत्रणा उसे भोगनी पड़ती है, अवशेष में यंत्रणा की परिसमाप्ति में जीव की जड़वत् परिणति होती है।

...क्रमश:

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

९। **पत्र (१०) - (प्रथम भाग)** कृपाहीन या कृपाशून्य योग ही गुरु का यथार्थ कर्म है.... । इसका उद्देश्य - काल की गति को रुद्ध करना एवं संसार के या सब दु:खों के मूल को उखाड़ फेंकना। व्यक्तिगत भाव में मुक्ति दु:खनिवृत्ति, शांति, निर्वाण, ऐश्वर्य परमानंद इत्यादि प्राप्ति के उपाय थे एवं अभी भी है। कृपाशून्य योगी के अतिरिक्त इस अखंड दु:ख मोचन का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। –(इस विषय पर श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य)।

उत्तर - (पत्र १० का प्रथम भाग) – सर्वप्रथम यह जानना या समझना होगा कि कृपाहीन या कृपाशून्य योग क्या है? –'कृपा' शब्द का अर्थ कर्म करके पाना; अर्थात् कर्म द्वारा जो प्राप्त हो सके उसे 'कृपा' कहते हैं। सद्‌गुरु प्रदत्त चिन्मय बीज दीक्षाकाल में आधार में वपन न होने तक जीवचेतना संपन्न साधक की आध्यात्मिक चेतना की अग्रगति होना संभव नहीं होता। अतएव दीक्षाकाल में सद्‌गुरु का अनुग्रह सबों के लिए वांछनीय है। यह सद्‌गुरु का अनुग्रह एक तरह की दैवी कृपा के रूप में जाना जाता है। किन्तु

सद्‌गुरु की दीक्षा या इक्षण रूपी अनुग्रह के बिना किसी की आध्यात्मिक पथ में उन्नति असंभव है। महात्मा कबीर ने कहा है, 'गुरु बिन कौन बतावै बाट' – अर्थात्, सद्‌गुरु के बिना अन्य कोई भी सत्य पथ का संधान नहीं बता सकता। सद्‌गुरु से दिव्यशक्ति-कणरूपी ब्रह्मबीज मंत्र और तत्प्रणव मंत्र के साधन कौशलरूपी ब्रह्मविद्या प्राप्त कर शिष्य जब कठिन तपस्याव्रती होते हैं एवं निज पुरुषकार बल से उस साधन सोपान को निज आत्मशक्ति एवं आत्मनिर्भरशील होकर सुदृढ़ विश्वास से तप:, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान के पर्यायों का साधन कर अतिक्रम करने में सक्षम होते हैं,

तब उस अवस्था में तपस्वी साधक आत्मयोगयुक्त होकर 'योगी' बन जाते हैं। इसे ही 'कृपाहीन या कृपाशून्य योग' कहते हैं।

इस योग के पर्याय में व्यष्टिगत भाव में आत्मकर्म के द्वारा कृपाशून्य साधक योगी प्राणायाम एवं मंत्र जप साधन बल से काल की गति को रोकने में सक्षम होते हैं, अखण्ड काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं प्राणायाम की सहायता से देहाभ्यंतरस्थ चंचल प्राण को स्थिर अवस्था में उपनीत करने में सक्षम होते हैं। प्राण को हृदय में एकबार उपनीत कर पाने पर तब कूटस्थ ब्रह्मरूपी गगनगुहा चंद्र एवं सूर्य ज्योति की छटा से आप्लूत हो जाता है। इस समय योगी की संपूर्ण अंतर्मुखी अवस्था। इस अवस्था के विभिन्न पर्याय में योगी देह के चेतना की ग्रंथियों का भेदन होता है एवं विभिन्न पर्याय के स्वाध्याय के सोपान समाप्त होने पर तब ईश्वर के प्रणिधान के पर्याय में ध्यान के गभीर में आत्मज्योति में एकबार योगी की सत्ता का लय हो जाने के पश्चात्, समाधि से उत्थित होने पर सब दू:खों का मूल उत्पाटित हो जाता है। कृपाशून्य योगी सद्‌गुरु भरोसे परम विश्वास में प्रवीण होकर निरंतर चेष्टा द्वारा इस प्रकार आत्मदर्शन एवं आत्म उपलब्धि पर्याय तक पहुँचने में सक्षम होते हैं। कृपाहीन योगी अनेक जन्मांतरों के शुभ संस्कार के वशवर्ती होकर किसी एक जन्म में 'आत्मज्ञानी' हो जाते हैं। आत्मज्ञ योगी को ब्रह्मज्ञ भी कहा गया है। जो सर्वदा आत्मा में योगयुक्त रहते हैं उनके आधार में अनन्त विभूति का प्रकाश घटित होता है। ये विभूतियाँ परवर्तीकाल में योगैश्वर्यरूप में आधार में परमाश्चर्य गुण के रूप में अवस्थान करती हैं, योगी शिवत्वलाभ कर परमानंद में और ब्रह्मानंद में विभोर रहते हैं। जब भी कोई इस ब्रह्म अवस्था में पहुँचते हैं तब सिद्धमंडल से जीव एवं जगत् कल्याण हेतु उनसे बारंबार अनुरोध किया जाता है कि जगत् गुरु या सद्‌गुरु रूप में धरा पर अवतीर्ण होकर जीव-जगत् को दुर्गति से रक्षित करें। इस पर्याय में कृपाहीन योगसिद्ध योगी के सत्ता में करुणा विभूति का उन्मेष होता है; तब वे धरणी पर सद्‌गुरु रूप में जीव एवं जगत् को इस करुणा विभूति द्वारा सींचने आते हैं।

कृपाशून्य योगी योग के सर्व पर्यायों से प्रत्यक्ष भाव में, विशद्‌भाव में तत्त्वगत भाव में, सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव में अवगत होते है इसीलिए वे समस्त पर्यायों के चिरस्थायी ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव इसीलिए कहते – 'सद्‌गुरुगण ऊपर से ही फरमान ले आते हैं। इस जगत् में उन्हें निज आधार हेतु कोई साधन नहीं करना पड़ता है, दूसरों के सद्‌गति हेतु ही उनका जगत् में आगमन होता है।' सद्‌गुरु रूपी कृपाहीन योगी के अलावा जीव के अखंड दु:ख (जन्मजन्मान्तर संबंधी दु:ख) मोचन का सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं होता। क्योंकि सद्‌गुरु हुए 'भगवान' या 'साक्षात् भगवान के प्रतिभू', ब्रह्मवेत्ता या भगवत्‌सत्ता।

दूसरे शब्दों में समष्टिगत भाव में कहा गया है कि पृथ्वी की दु:खभार मोचन अवस्था किसी भी दिन नहीं थी एवं भविष्य में भी यह संभव नहीं। आचार्य गौड़पाद के मतानुसार –'सृष्टि या जगत् संसार अनादि अनंत'; इस क्षेत्र में व्यक्तिगत मुक्ति, दु:ख निवृत्ति (जन्म-मृत्यु चक्र के आवागमन से मुक्ति) होना संभव है, जो तप: सापेक्ष है। किन्तु समष्टिगत भाव में सृष्टिधारा नित्य, अनादि अनन्त होने से समष्टिगत मुक्ति, दु:खनिवृत्ति संभव नहीं है। यही दिव्य परिचालित सृष्टि का नियम है। डा: गोपीनाथजी के 'विशुद्धवाणी' नामक पुस्तक में श्रीश्रीनवमुण्डी महाआसन अध्याय में है –'अक्षरपुरुष' कूटस्थ या साक्षी चैतन्य ये सबों के द्रष्टा – इन्हें कोई देख नहीं पाता, ये सबों का आत्मस्वरूप। इनके दर्शन का नाम ही है आत्म-दर्शन। किन्तु स्वभाव के विचित्र लीला से कूटस्थ पुरुष द्रष्टा होने पर भी आत्मविस्मृत है। ये सब कुछ देखते हैं, केवल स्वयं को नहीं देखते, अर्थात् समग्र विश्व ही इनकी दृष्टिसम्भूता। किन्तु यह सृष्टि निद्राविष्ट दृष्टि एवं दृश्य स्वाप्निक दृश्य। ये जब नींद से जगेंगे तब स्वप्न नहीं रहेगा एवं स्वप्न दृष्ट दृश्य भी नहीं रहेंगे। स्वभावत: सबों को आत्मदर्शन होगा। प्रणव-पुरुष (कारण-सलिल में शायित जो नारायण या महाविष्णु) रूप में इन्होंने ही तो बहु होने का संकल्प किया है, इसीलिए ये स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर अनेको का आत्मदर्शन एवं स्वरूप में प्रतिष्ठा संपन्न होंगे।'' – प्रकृतपक्ष में यह एक असंभव संभावना क्योंकि किस क्षण भगवत् इच्छा होगी एवं अक्षर-पुरुष जाग्रत होंगे प्रणव-पुरुष स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, यह कोई नहीं बता सकता। अतएव यह कृपाशून्य योगी के भी असाध्य है। *...क्रमश:*

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(४)

सद्‌गुरु माहात्म्य – *पूर्व प्रकाशित अंक के पश्चात्....*

श्रीश्रीमाँ – आध्यात्मिक पथ पर आने के लिए सर्वप्रथम जानना होगा कि तुम क्या चाहते हो? – जागतिक सुख चाहते हो या आध्यात्मिक विषय के सत्य को जानना चाहते हो? आध्यात्मिकता में सर्वप्रथम जानना होगा, ''मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ एवं कहाँ जाऊँगा? - अर्थात्, आत्मज्ञान या आत्मा की खोज। तुम्हारे मध्य जो सत्ता है, जो बोध कराती है, वह कहाँ है या वह कैसी है? देखो, तुम क्या चाहते हो वह भी तुम्हें जानना होगा और क्या नहीं चाहते हो वह भी तुम्हें जानना होगा।

जनैक व्यक्ति –मैं क्या नहीं चाहता हूँ, कुछ–कुछ वह मैं जानता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ वह मैं नहीं जानता।

श्रीश्रीमाँ - तुम क्या चाहते हो वह भी तुम्हें जानना होगा और जानकर अपने अहं का परित्याग करना होगा। 'मैं' क्या चाहता हूँ, वह ना जानकर निजस्व अहं के वशवर्ती होकर जो सत्य के संधान में चलने के लिए सोचते हैं उन्हें इसीप्रकार उद्‌भ्रान्त के सदृश जन्म–जन्मांतर काटना होगा, कुछ लाभ नहीं होता, सिर्फ कर्मफल संचय होते हैं प्रारब्ध के चक्कर में गिरकर केवल कालचक्र में घूमता रहता है। जो सद्‌गुरु की महिमा नहीं समझते, उसके अन्तर में शुभेच्छा जाग्रत नहीं हुई समझना होगा। उसे किसी महात्मा के आदर्श को ग्रहण कर गुरुकरण कर समर्पण करना होगा। देखो, तुम नागपुर से आये; तुमने नागपुर का रास्ता पकड़ा, तत्पश्चात् यहाँ का पथ पहचाना। तुमने एक मार्ग जाना, हो सकता है इस पथ का संधान तुम्हें अन्य किसी से मिला हो। यहाँ आने के लिए यदि तुमने दस रास्तों की खोज की हो तो निश्चय ही तुम्हें यहाँ पहुँचने में देरी होगी। तुम्हें भगवान ने एक रास्ता दिखा दिया अब यदि इस रास्ते पर चलते हुए तुम सोचने लगो, 'इस रास्ता में मुझे सुविधा नहीं हुई और एक अन्य रास्ता खोजता हूँ' - तब तुम पुन: देखोगे कि वहीं पहले रास्ते में ही भूल से आ गये हो - इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन रास्तों पर भटकते हुए ही निकल जाएगा और सत्य का संधान कब करोगे? देखो जो प्रकृत महात्मा होते हैं वे अधिकतर अपना देश, अपना आसन छोड़कर कहीं नहीं जाते। जैसे, श्रीश्रीआनन्दमयी माता, श्रीश्रीरामठाकुर, श्रीश्रीनांगाबाबा, श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, श्रीश्रीसीतारामदास बाबा, श्रीतैलंग स्वामी, श्रीरामकृष्णदेव, नामदेव, तुकाराम, नानक, कबीर इत्यादि तीर्थभ्रमण के अतिरिक्त बिना प्रयोजन ईश्वर के निर्देश के बिना स्वदेश के आसन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, तथा प्रयोजन भी नहीं होता। जिसके समीप परमार्थ रहता है, वे सर्वदा भगवत् महिमा से युक्त अवस्था में रहते हैं, भगवत्-निर्देश से सब कुछ करते है। भगवान का नाम प्रचार करते, वे भगवत् क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाते। भारतवर्ष चिन्मय भूमि है, महात्माओं को नाम यश प्रतिष्ठा का प्रयोजन नहीं होता। वे जीव के कल्याण साधन कर शान्त अवस्था में अवस्थान करते हैं। सत्य को खोजो, जल्दबाजी एवं जटिल व्यर्थ की चिन्ता करके कोई लाभ नहीं होता। यह जान कर रखना कि प्रत्येक के अन्तर में आलोक की spark (चिंगारी) है। मैं यदि मन-मन में तुम्हें एक चिन्ता की तरंग प्रेरण करती हूँ - एक विद्युत् झलक (spark) देखोगे। मेरी दीक्षित सन्तानें जानती है कि कूटस्थ में spark light (विद्युत् झलक) का दर्शन क्या चीज हैं। सिर्फ spark क्यों! आत्मज्योति! अनाहत चक्र के मध्य से हृदय-कमल किस प्रकार देखा जाता है, यहाँ मेरी दीक्षित सन्तानों में से अनेक ही यह जानते है। यह महावतार बाबाजी महाराज का चिन्मय क्षेत्र है। महावतार बाबाजी के साथ उनके परिमण्डली का आना-जाना यहाँ सब समय रहता है। मैं उनके शरणागत हूँ, इसीलिए कूटस्थ से संबंधित प्रसंगों को समझना सीखी हूँ। तुमलोग भी सद्‌गुरु के शरण में आओ, निश्चय ही चिन्मय ज्योति के स्पर्श को पाओगे। मेरे सद्‌गुरु की देह रामकृष्ण परमहंसदेव की देह थी। वे हठयोग, क्रियायोग सिद्ध महापुरुष थे। देखो, साधन जीवन में चलने की राह में अनेक दृश्य आऐंगे, किन्तु उन सब दृश्यों को देखकर भ्रमित मत होना, वह ध्यान नहीं है। मायामुक्त हो रहे हो कि नहीं वह लक्ष्य करो। अहं मुक्त हो रहे हो कि नहीं, उसे स्वयं के भीतर अनुभव करो और सद्‌गुरु के शरणागत होओ।

...क्रमश:

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

बुद्धि की जितने प्रकार की वृत्ति है, उन सबों को तीन श्रेणी में विभक्त किया जाता है। सात्त्विकी, राजसिकी व तामसिकी ये तीन प्रकार की वृत्तियाँ हैं।

सात्त्विकी वृत्ति यथा - श्रद्धा, भक्ति, विवेक, वैराग्य इत्यादि। राजसिकी वृत्ति यथा - काम, क्रोध, लोभ इत्यादि और तामसिकी वृत्ति का कार्य आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, मोह इत्यादि। सत्त्व, रजो एवं तमो ये त्रिगुण परस्पर विरोधी। रजो, तमो गुण को पराभव कर सत्त्वगुण उदित होता है। सत्त्व, तमो गुण को पराभव कर रजोगुण उदित होता है एवं सत्त्व एवं रजो गुण को पराभव कर तमोगुण उदित होता है। परस्पर विरोधी होने से तुम वे सभी वृत्तियाँ नहीं हो सकते हो। तुम जैसे वाह्य समस्त वस्तुओं के ज्ञाता होकर उससे अलग हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन बुद्धि के अभ्यंतर में काम, क्रोध, लोभ, भक्ति, दया, वैराग्य इत्यादि जो समस्त वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, तुम उनके ज्ञाता व द्रष्टा एवं उन सबों से अलग। जैसे समुद्र से तरंग उठने पर वे तरंग समुद्र के आकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वैसे ही मन, बुद्धि से उत्पन्न वृत्ति मन, बुद्धि का ही आकार है। ये समस्त ही जड़ एवं त्रिगुणात्मक। तदातीत तुम चेतन होकर उन सबों के ज्ञाता हो। इसीलिए तुम हो त्रिगुणातीत एवं गुणों के द्रष्टा, ज्ञाता तथा भोक्ता। तुम्हारा मन-बुद्धि द्रष्टा हैं, ज्ञाता एवं भोक्ता नहीं। वे जड़ होकर भी चेतन के साथ संयुक्त होकर चेतन के सदृश प्रतीत होते हैं। जीव का आत्मज्ञान आवृत होने के कारण अज्ञानवश मन, बुद्धि को ही आत्मा समझकर जानता है। मन, बुद्धि को ज्ञाता कहने पर उनका इन्द्रियत्व नहीं रह जाता। श्रुति ने इन सबों को इन्द्रिय कहा है। 'शक्ति विपर्य्ययात्' इस सूत्र में वेदान्त दर्शन में वही प्रकाशित है। आत्मा ही सर्वज्ञात् द्रष्टा है। इसका अर्थ है – परमात्मा के अलावा अन्य कोई द्रष्टा नहीं हो सकता। श्रुति में आगे अन्य कथन है – 'येन सर्वमिदं विज्ञातं तं केन विजानीयात्, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'। अर्थात्, जो कुछ अनुभूत होता है, वह परमात्मा द्वारा ही होता है। उनको और किसके द्वारा देखा जाय, श्रुति ने उसे 'मनोवाचामगोचरं, अवाङ् मनसगोचरम्' इन सभी वाक्यों के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है और भी कहा है 'याता वाचा निव्वर्त्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह' अर्थात्, वे वाक्य एवं मन के अतीत हैं। भगवद्गीता में कहा गया है –'ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं'। वे वाक्य, बुद्धि, मन से अगोचर होने पर भी ज्ञानगम्य हैं। ज्ञान आवृत होने के कारण जीव उन्हें नहीं जान पाता, किन्तु साधन द्वारा प्रकट होने से जीव स्वयं को ब्रह्म कहकर संबोधित करता है। वही ब्रह्म समस्त जीवों में आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है; जैसे सूर्य के देदीप्यमान होने पर भी तुम्हारी आँखें आवृत रहने पर तुम उन्हें देख नहीं पाते हो। आवरण उन्मोचन होने पर तब तुम देखने में सक्षम होते हो; उसी प्रकार परमात्मा ने अपने माया द्वारा तुम्हें आवृत रखा है जिससे तुम्हारा ज्ञान एवं ऐश्वर्य स्वाभाविक होने पर भी तुम ज्ञान, ऐश्वर्यहीन हो गये हो। वेदान्त-दर्शन में सूत्र है –'पराभिधानत्तु तिरोहितं अतोहस्य बंध विपर्ययो'। इसका अर्थ है – परमात्मा संकल्पबल से जीव का ज्ञान एवं ऐश्वर्य तिरोहित होता है। तत्पश्चात् सूत्र के अनुसार – 'देह योगाद्धा'। देह, मन, प्राण इन्द्रियादि संयुक्त होने के पश्चात् ही ज्ञान तिरोहित होता है। ये उभय वाक्य ही सत्य हैं।

सृष्टिकाल में परमात्मा निज स्वरूप के एक अंश को माया द्वारा आवृत कर उस अंश से वे स्वयं 'जीव और जगत्' रूप धारण करते है। परमात्मा का अवशिष्ट अंश अविकृत ही रहता है। इसीलिए जीव को परमात्मा का अंश कहते हैं। जीव और परमात्मा अभिन्न हैं यही कहा जाता है। भगवद्गीता में कहा गया है - 'विष्टव्याहमिदं कृत्स्न एकांशेनस्थित जगत्'। अर्थात्, यह जगत् उनके एक अंश में स्थित है। उन्होंने उसे धारण कर रखा है। आगे कहा गया है – 'ममैवांश जीवलोके जीवभूत: सनातन:'। इसका अर्थ - जीवभूत: शब्द का अर्थ -जीव था नहीं जीव सृष्ट हुआ। ईश्वर के एकांश से जीव का अस्तित्व हुआ। जीव का ज्ञान, ऐश्वर्य एवं मोक्ष नित्य एवं स्वाभाविक है। ये सब माया के आवरण द्वारा आवृत है। भगवद्गीता में कहा गया है -

'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन ही तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्य वद्- ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परं'। इसका अर्थ - अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत रहने से जीवगण मोहग्रस्त होते हैं। ज्ञान के द्वारा अज्ञान के तिरोहित होने पर आदित्यवत् ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञानोदय होने से जीव स्वयं को अखंड चैतन्य के रूप में ज्ञात करता है अंशरूप में नहीं। जब आवरण अनावृत होता है, तब उसका नित्यसिद्ध स्वयंप्रकाश स्वभाव अभिव्यक्त होता है। इस विषय को महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में बहुत सारे सूत्रों द्वारा प्रकाशित किया है। उसी स्थान पर ज्ञानप्राप्त विदेहमुक्त पुरुषों के विषय में कहा है। उस विषय पर बाद में प्रकाश डालूँगा।

भगवद्गीता में उक्ति है 'आत्मशुद्ध स्वयंपूर्णः सच्चिदानंद विग्रहः। तथापि जीव निर्लेपो मोहित मममाया। अहं सुखी च दुःखी च इत्येवभिमन्यते'। इसका अर्थ है – 'सच्चिदानंद विग्रह' अर्थात् सत्-चित् आनंद ही जिसका रूप है। श्लोक का अर्थ है -ये परमात्मा त्रिगुणातीत, स्वयंपूर्ण एवं सच्चिदानंद रूप, जीव भी उसी प्रकार निर्लेप स्वभाव होने पर भी मेरे माया द्वारा मोहग्रस्त होकर मैं सुखी, मैं दुःखी इस प्रकार अभिमान करता है।

घेरण्डसंहिता में परमात्मा ही जीव का स्वरूप है ऐसी उक्ति है। यथा –

'अहं देवो न चान्योहस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्।
सच्चिदानंद रूपहं नित्यमुक्त स्वभाववान'।।

परमात्मा जीव के समक्ष अज्ञानवश अप्रकट होने पर भी साधन द्वारा प्रकट होते हैं। यह निम्नलिखित सूत्र द्वारा वेदान्त दर्शन में प्रकाशित है, यथा – 'प्रकाशादि वच्चा वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्'। अन्यसूत्र में -'अपि संराधने पूंस्तादिवत् वाल्ये' - इस सूत्र द्वारा कथित है - जिस प्रकार बाल्यावस्था में काम अप्रकट रहता है बाद में यौवनकाल में प्रकट होता है - इसी प्रकार ज्ञान देहमध्य अप्रकट रूप में रहकर भी बाद में प्रकट और प्रकाशवान होता है। पूर्व में नहीं था पश्चात् में आया, ऐसा नहीं है। अप्रकट भाव में था, परवर्तीकाल में प्रकट हुआ। यही उसके तात्पर्य का अर्थ है।

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

उन्मेष

(२५)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)
क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–
गतांक से आगे...

जिज्ञासु – यह कैसे समझ में आयेगा कि प्राणायाम किस नाड़ी से हो रहा है?

श्रीश्रीमाँ – अन्तर में चेतना जाग्रत होने पर ही समझ सकोगे। सुषुम्ना में प्राणायाम होने से लगेगा मानों कुछ भी नहीं हो रहा है – एक तरह का अभाव बोध रहेगा। इसका कारण यह है कि सुषुम्ना है आकाशमार्ग। एक-एक स्तर के आकाश को अतिक्रम करने के लिए योगी को धैर्यपूर्वक प्राणायाम साधन करते जाते रहना चाहिए। सुषुम्ना में प्राणों की गति प्रविष्ट होने पर अपने-आप प्राणों का सम्प्रसारण होता है। सुषुम्ना में अन्धकार आकाश का ही योगी को दर्शन होता है। अन्धकार आकाश में तब निज बोध लेकर योगी को शून्य में तैरना पड़ता है – तैरते-तैरते शून्य का जो शब्द या नाद, विभिन्न स्तरों की विभिन्न प्रकार की नादध्वनि तब योगी के अन्तर-श्रवण में स्फुरित होती है। उस नादध्वनि में मन युक्तकर योगी तब नादानुसन्धान करना आरम्भ करता है। नादध्वनि में मन युक्त होने पर एकदिन नाद के उत्स ज्योति को योगी कूटस्थ के आकाश पर दर्शन कर सकता है। उस ज्योति के मध्य ही विश्व का रूप है। प्राणायाम की सहायता से योगी की चेतना जितनी उन्नत से उन्नत स्तर में प्रविष्ट होती है, तब योगी के अन्तर में चिन्मय बुद्धि या बोधि का जागरण होता है। वह बोधि योगी को उपलब्धित ज्ञान प्रदान करती है। उस बोधि के द्वारा ही योगी कौन सी अवस्था में क्या हो रहा है, वह सटीक बोधगम्य कर सकता है।

प्राणायाम साधना करते-करते सुषुम्ना मार्ग में अटल होकर लगे रहना साधक को अभ्यास करना पड़ता है। सुषुम्ना के शून्यमार्ग में युक्त रहने पर भी जागतिक कामकाज किया जा सकता है। एकबार सुषुम्ना में विचरण करने का अभ्यास हो जाने पर सुषुम्ना में चेतना की भूमि आदि स्पर्श कर तब प्राणायाम स्वयं ही होता रहता है, तब स्वयं को चेष्टा करके और प्राणायाम नहीं करना पड़ता, एकबार प्राणायाम शुरु हो जाने पर भीतर से प्राणायाम अपने-आप ही चलता रहता है।

अर्थात्, स्वयं के भीतर जो आत्मगुरु हैं, उस आत्मशक्ति के साथ योगी की चेतना युक्त हो जाती है। हंसरूपी स्पन्दन से युक्त होकर प्राणायाम अपने आप ही ऊपर उठता है, अपने आप ही उतरता है – इसे स्तब्ध नहीं किया जा सकता – प्राणायाम एक समय स्वयं ही स्तब्ध हो जाता है। तब 'केवली' बोध होकर शून्य बोध से शून्यरूपी आकाश में स्वयं ही प्राणों की गति स्थिर होती है।

जिज्ञासु – चक्र-चक्र में जप की संख्या बढ़ाने का क्या कोई नियम है?

श्रीश्रीमाँ – अभ्यास के द्वारा प्राणायाम को सम्प्रसारित करना पड़ता है एवं अपने आधार को बड़ा करना पड़ता है एवं तभी प्राणायाम के समय हरेक चक्र पर जप की संख्या बढ़ानी पड़ती है। जैसे धनुष। तुम्हारी देह भी तो एक धनुष के ही समान है - धनुष की ज्या या डोर को बड़ा करने के लिए आस्ते-आस्ते खींचकर बड़ा करना होता है – एकबार में ही तुम यदि जोर से टंकार देने के लिए खींचो तो हो सकता है गुण का डोरी कट भी जा सकती है। इसीलिए धीरे-धीरे तुम्हें अपनी धनुष की ज्या को खींचकर क्रमशः बड़ा करना होगा। वह जैसे क्रमशः बढ़ती है, ठीक वैसे ही देहरूपी ज्या के मध्य प्राणायाम के खिंचाव के साथ जप की संख्या अभ्यास करते-करते क्रमशः बढ़ानी पड़ता है। वह जैसे क्रमागत विस्तारित होता है तब देहाभ्यन्तरस्थ नाड़ियाँ प्राणायाम के खिंचाव की शक्ति को धारण करने में समर्थ होती है। अन्यथा नाड़ी के धागे कट जाने से योगी की देह में विविध व्याधि का उपसर्ग दिखाई देता है इसीलिए प्राणायाम साधना गुरोपदेशागम्य होना उचित है। *...क्रमशः*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

पुराण कथा

रेवती नक्षत्ररूपा कन्या रेवती

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

ऋतवाक् नाम के एक मुनि थे। रेवती नक्षत्र के उत्तरांश में उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्मग्रहण किया। इस पुत्र के जन्म के पश्चात् से ही ऋतवाक् मुनि और उनकी पत्नी नाना प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त हो गये।

इसके अतिरिक्त वह पुत्र भी अपनी उम्र के साथ-साथ अति अधर्माचारी हो गया। यही कारण था ऋतवाक् अतिशय मानसिक कष्ट के साथ दिन अतिवाहित करने लगे। एकबार उन्होंने गर्ग मुनि से अपनी समस्त व्यथाओं का निवेदन कर पूछा, किस दोष के कारण उन्हें इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग करने पड़ रहे है। गर्ग मुनि ने कहा कि इस पुत्र ने रेवती नक्षत्र के अन्तभाग में जन्मग्रहण किया है इसीलिए उनके समक्ष अनेक क्लेश उपस्थित हो रहे है। तब ऋतवाक् मुनि ने रेवती नक्षत्र को अभिसम्पात किया एवं उस अभिशाप से रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुदपर्वत पर पतित हुआ। उस समय से ही कुमुदपर्वत का नाम रैवतक पड़ा। उस नक्षत्र की कान्ति से एक पद्मसमाकुल सरोवर की सृष्टि हुई एवं उस सरोवर से एक परमा सुन्दरी कन्या उद्भूत हुई। मुनि ऋतवाक् ने उस कन्या का नाम रखा - 'रेवती'।

कालक्रमानुसार रेवती रैवतक गिरि की कन्या के रूप में जानी गई। 'प्रमुच' नाम के एक राजर्षि ने रेवती का स्वकन्या के सदृश लालन-पालन किया। राजर्षि प्रमुच ने यज्ञाग्नि से आदर सहित जिज्ञासा किया कि किसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। अग्नि ने तब कहा कि विक्रमशील के पुत्र राजा दुर्द्दम या दुर्गम के साथ रेवती का विवाह होगा। कालक्रम से दुर्द्दम नृप आखेट के पश्चात् प्रमुच के आश्रम में उपनीत हुए। राजर्षि प्रमुच ने जब उसके साथ रेवती का पाणिग्रहण कर गार्हस्थ स्वीकार करना चाहा तब कन्या रेवती ने आपत्ति जनाई और कहा कि रेवती नक्षत्र के सिवा अन्य नक्षत्र में वह विवाह नहीं करेगी। रेवती के पालक पिता प्रमुच जब उसे किसी प्रकार भी राजी न कर पाए तो उन्होंने उसकी इच्छा पूरण हेतु ऋक्ष को गगन में स्थापित कर प्रियव्रतवंशी विक्रमशील राजा के पुत्र दुर्द्दम के साथ रेवती का विवाह कर दिया। रेवती के गर्भ से 'रैवत' नाम के एक पुत्र ने जन्मग्रहण किया। यह पुत्र ही 'रैवत मनु' नाम से ख्यात हुआ।

कहानी का गुढ़ार्थ :- पृथ्वी के आकाशमण्डल में अवस्थित विभिन्न नामधारी समस्त नक्षत्रादि चिन्मय है एवं उनका एक देव या देवी रूप है। उपरोक्त कहानी यही इंगित करती है। जैसे, सप्तर्षि मण्डल के सप्तर्षियों के चिन्मय नाम है एवं रूप का भी अस्तित्व है, जिसका प्रमाण हमलोग वेद, पुराण से पाते है, ठीक वैसे ही अनुराधा, स्वाती, भरणी,

कृत्तिका इत्यादि का भी देवीरूप है। ऋक्ष, शुक, ध्रुव इत्यादि देव नक्षत्रों का भी अस्तित्व है। आकाशतत्त्व से पूर्णज्ञान सम्पन्न योगी ऋषिगण नक्षत्र मण्डल के प्रकृत रहस्य से अवगत होते है। (*सहायक ग्रंथ : मार्कण्डेय पुराण और स्कन्द पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

भ्रमण

महाप्रस्थान के पथ पर

(२)

महाप्रस्थान के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आकर पहुँचे दो विशाल हिमवाहों के संगमस्थल पर। नदी के स्वच्छ नीले जल का चिह्न आँखों से दृश्यमान नहीं हो रहा है। दोनों तरफ बिखरे टूटे-फूटे पत्थर एवं धूल-बालू मिश्रित बर्फ के स्तूप। दोनों तरफ खड़े हिमवाहों को देखने पर ऐसा लगा मानो प्राणहीण रक्तहीन एवं वर्णहीन दो बाहुओं का मिलन हैं। हाथ से हाथ मिलाकर दो विशाल कंकाल-सदृश खड़े हैं। उसी बीच कहीं-कहीं पिघले हुए हिमदर्रो के तमसाच्छन्न गह्वर, मानों कंकाल के ज्योतिविहीन नयनों के शून्य कोटर हो। अलकानंदा के हिमवाह के पास आ पहुँचे। पथ पर के बर्फ यहाँ अभी कहीं-कहीं पिघल गये हैं। फिर भी चारों तरफ हिमशैल सिर उठाये खड़े हैं। हिम मंडित पाषाणों पर से बर्फ के पिघलने पर इधर-उधर बिखरे विचित्र वर्ण के बहुत सारे पत्थर दृश्यमान हो रहे हैं। रास्ते का कोई निशान ही नहीं है। जिस तरफ से जाया जा सकता है उधर से ही जा रहें हैं, वही हमलोगों का पथ है। केवल लक्ष्य की दिशा में दृष्टि टिकी है। पथावरोध किए विशाल प्रस्तर फैले हैं। हाथों पर भार देकर एक पत्थर पर चढ़कर अन्य दूसरे पत्थर को कूँदकर पार कर रहा हूँ। संगी कुत्ता ही पथ दिखाकर आगे ले जा रहा है। थोड़ी दूर दौड़ कर जाता, फिर खड़ा होकर पीछे घूमकर देखता। सही रास्ते पर चलते देखकर खुश होकर पूँछ हिलाता फिर आगे बढ़ता, फिर रूकता, घुमकर देखता। पिछड़ते हुए देखकर दौड़कर पास आ जाता। कुछ देर साथ चलता। फिर आगे बढ़ जाता।

कुछ देर से पानी गिरने की आवाज सुन रहा था अब उसका कारण दिखा। बाँयी तरफ नीलकंठ पर्वत, उसी से निसृत होकर कई जलधाराएं गिर रही हैं। बहुत दिनों से जो तुषार राशि पर्वत से अंगीभूत होकर स्थिर एवं स्तब्ध थी, ग्रीष्म का तीव्र ताप, सूर्य के स्वर्ण तीली का स्पर्श पाकर जग पड़ी है इन निर्झरिणियों। आकाश छुते पर्वत शिखरों से जलधाराएं मुक्ति का उच्छ्वास लिए धरणी के हृदय पर उतर रहीं हैं। यहाँ पर ये सहस्र-धारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सामने पाँच बड़े-बड़े जलप्रपात दिखाई दे रहे हैं। यही वह पंच धारा तीर्थ जो पुराणोक्त बद्रीनारायण तीर्थ क्षेत्र के विवरण में हिमगिरि के नैर्ऋत्य दिशा में अवस्थित है ऐसा वर्णित है। वे धाराएं उतरकर जहाँ नदी का रूप लेती हैं वहाँ पर आ पहुँचे। उस पार जाना होगा। पुल नहीं हैं न ही उसका प्रयोजन है क्यों कि जल की गहराई अधिक नहीं है। समतल भूमि पर जलस्रोत समूह चारों तरफ फैल कर बह रहे हैं पानी की धारा में तीव्रता नहीं है। पर यह हिम-विगलित जल तुषार से भी शीतल है। सावधानी पूर्वक पार कर गये। उस पार जाने पर चढ़ाई सामान्य ही थी। उसके बाद फिर उबड़-खाबड़ रास्ता। अल्पवृष्टि होने लगी, इसलिए बरसाती कोट पहनकर चलने लगा। देखते-देखते तीव्र वृष्टि आरंभ हो गयी। पथ से सटी एक छोटी गुफा में आश्रय लिया। हू-हू कर वायु गुहा में प्रविष्ट हो रही थी। कंप-कंपाती शीत। वृष्टि रूकने पर पुन: यात्रा आरंभ हुई। आगे मेरुदण्ड सदृश पथ - Razor Edged Ridge। एक पतली रेखा के ऊपर चलना। दोनों तरफ पर्वत का ढालू अंग। नीचे तीन-चार सौ फूट खड़ी उतराई। थोड़ी सी असावधानी जान ले सकती है। यहाँ पर नकुल, सहदेव ने स्थूल काया का त्याग किया था। भूपेन्द्र के निर्देशानुसार इधर-उधर न देखकर केवल पैरों पर नज़र रखते हुए मैं वह मेरुदण्ड सदृश पथ पार कर गया। आ पहुँचा चक्रतीर्थ में जो सर्वेक्षण-नक्शों में 'माजना' के नाम से उल्लेखित है। इसी चक्रतीर्थ में तपस्या कर अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। महाप्रस्थान के पथ पर इसी स्थान पर अर्जुन ने स्थूल काया का त्याग किया था। चक्रतीर्थ को चारों तरफ से गगनचुंबी पर्वत चोटियों ने घेर रखा है। इनके मध्य ही है वह चक्राकार समतल विस्तृत क्षेत्र। ऐसा लगता है यह पहाड़ों से घिरा हुआ गोलाकार झील था जो सुखकर पाषाण मंडित मैदान बन गया। उससे निसृत एक-दो झरने टेढ़े-मेढ़े बह रहे हैं। उस मैदान से थोड़ा ऊपर

पत्थरों के समूह के पास कई गुहाएँ थी, जिसके समीप हमलोगों ने अपना तंबु लगाया। तुषार शिखरों पर अस्तगामी सूर्य की रश्मियों के आपतित होने से विचित्र वर्ण की छटा परिलक्षित हो रही थी। धीरे-धीरे शाम होने लगी। आकाश का लाल प्रकाश थोड़ा म्लान हो गया। पर्वत का हिमस्पर्श सिहरन पैदा कर रहा था। हमलोगों ने तंबु का आश्रय लिया। मध्य रात्रि में अचानक निद्रा भंग हो गयी। वज्रपात-सदृश प्रचंड ध्वनि श्रुतिगोचर हुई। मेघहीन सुनील आकाश में तारों का मेला। मेघ या वृष्टि का चिह्न भी नहीं था, फिरभी यह कैसा वज्रपात जैसा शब्द विद्युत् झलक-रहित। दूसरे दिन प्रात:काल चक्रतीर्थ को छोड़कर आगे बढ़े। सिर में भारीपन का अनुभव हुआ, मैं समझ गया यह अधिक ऊँचाई के कारण था। चढ़ाई थोड़ी ही थी। चढ़ाई के समाप्त होते ही पहाड़ के दूसरी तरफ का ढलान। पुन: उबड़-खाबड़ रास्ता। कभी-कभी वैसा ही तलवार के धार की तरह का पथ। चारों तरफ धूप फैली हुई है। अचानक मैंने गत रात्रि जैसा ही वज्रपात सदृश शब्द सुना। देखा की दूर नीलकंठ पहाड़ से बर्फ का स्तूप टूटकर गिर रहा है – हिमप्रपात (Avalanche)। पहाड़ के नीचे का अंश धूसर एवं वर्णहीन है। हिमरहित। आँख झपकते ही देखा कि ऊपर उस शुभ्र वाष्पमंडल को भेदकर श्वेत हिम की लपलपाती जिह्वा नीचे उस पहाड़ से सटी हुई आड़े-तिरछे विद्युत् वेग से उतरी आ रही है। चारों तरफ तेज एवं धीरे आवाजें हो रही हैं। दूसरी तरफ के पर्वतगण इस ध्वनि का आदान-प्रदान कर प्रतिध्वनित हो रहे हैं। तत्पश्चात् हठात् पुन: सब शान्त, शब्दहीन, गतिहीन। मानों स्वप्न हो - कहीं कुछ हुआ ही नहीं; परन्तु दूर इस क्षणिक प्रलय द्वारा अंकित सुस्पष्ट चिह्नों को देखा। थोड़ी देर पहले जहाँ बर्फ था ही नहीं वह स्थान तुषारावृत हो गया है। जिस तुषार स्तूप से हिमप्रपात हुआ उस अवशिष्ट तुषारपिंड में अपूर्व वर्ण परिवर्त्तन दिखाई दिये। हिम का पूर्णतया श्वेत रूप अब वहाँ नहीं है। टूटे हुए अंश में नीला, हरा पारदर्शी-कठिन तुषार दर्शित हुआ मानों टूटा हुआ नीले काँच का बोतल, जिस पर पड़ती सूर्य रश्मियाँ वर्ण-विन्यास उत्पन्न कर रही है। अब समझ में आया विगत रात्रि का बिना बादल के वज्रपात के शब्द का कारण। 'भयंकर सुन्दर' इसे ही कहते हैं।

पैरों पर सावधानी पूर्वक भार देकर शरीर को सम्हालते हुए जैसे तैसे मेरुदण्ड सदृश पथ पर चल रहा हूँ। दाहिनी तथा बाँयी दोनों तरफ गहरी खाँई है। मैंने देखा कि कुत्ता रास्ता छोड़कर एक जगह नीचे उतर गया। जाने से पूर्व उसने कई बार जोर से भूँका। तत्पश्चात् नीचे जाकर सीधे चलने लगा। बीच बीच में दौड़कर ऊपर आता, सिर घूमाकर नीचे की ओर इशारा करते हुए नीचे की तरफ दौड़ता तथा पुन: दौड़कर ऊपर आता। ऐसा लग रहा है कि वह हमलोगों को नीचे जाने हेतु बार-बार संकेत कर रहा है। भूपेन्द्र से इस संबंध में कहने पर वह कहा कि, ''हमलोग सही रास्ते पर चल रहे हैं''। हठात् गुरु माँ की एक बात याद आ गयी। 'रास्ते पर चलते समय अगर कोई बाधा उपस्थित कर रहा हो वह चाहे कुत्ता, बंदर या कोई मक्खी ही क्यों न हो उसे मेरा ही निर्देश समझना।' माँ की बात का स्मरण कर कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। भूपेन्द्र को यह सूचित करता कि ऊपर के रास्ते में अवश्य कोई बाधा है इसलिए हमलोगों के लिए नीचे के रास्ते से चलना ही श्रेयस्कर होगा। मेरी बात सुनकर उसने बेमन होकर रास्ता बदल दिया। श्वान निर्दिष्ट पथ पर ही आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा दूर आगे जाने पर मैंने देखा कि ऊपर का रास्ता धँस गया है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पूँछ हिलाते हुए वह कुत्ता दौड़कर बिल्कुल पास आ गया। उसकी भंगिमा ऐसी लग रही थी मानों वह कह रहा हो कि, 'मैं कह रहा था न कि ऊपर का रास्ता बंद है। नीचे के रास्ते से चलना ठीक होगा, मगर तुमलोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे।' भूपेन्द्र भी अवाक् रह गया। मेरे मन में आनंद हिलोरे ले रहा था। माँ के स्नेह का स्पर्श मिला। सभी क्षेत्रों में वह हमारी निगरानी कर रही हैं। धीरे-धीरे पथ पर चल रहा था। बिखरे हुए बड़े-बड़े पाषाणों के मध्य से बहते हुए बहुत सारे झरनें की धाराओं को देखा। जमीन के ऊपर पाषाणों के आसपास यहाँ अभी भी धवल हिम जमा हुआ था। कहीं बरफ गल कर जलधारा नीचे उतर रही है। जल में बर्फ के टूकड़े प्रवाहमान हैं। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पाँव रखते हुए जलधारा को पार कर रहा था। हिम के ऊपर अति सावधानी पूर्वक पैर रख रहा हूँ। समक्ष ऊँचा लम्बा बाँध की तरह का एक स्थान। हल्के पाँव से ऊपर आ रहा हूँ। और ऊपर चढ़ते ही विस्मय से अवाक हो गया। ठीक सामने त्रिभुजाकार शतपंथ ताल। सुना है त्रिकोण में तीन देवताओं का निवास है – ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। वे

लोग वहाँ ध्यानमग्न हैं। कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। प्रकृति का प्राकृतिक देवायन। ऊपर सुनील आकाश। चारों तरफ अमल, धवल तुषार मानों श्वेत पत्थर से निर्मित दीवारें। नीचे विस्तीर्ण जलराशि निस्तरंग स्फटिक, स्वच्छ प्रशांत सरोवर। मानों नीलकंठ के कंठ पर लटकती नीलकांत मणि। दुर्गम पथ की अति क्लान्ति क्षणमात्र में दूर हो गयी। चाल को धीरे-धीरे संयत कर धीमी गति से झील के तट पर उतरने लगा। मन में असीम आनंद। झील के तट पर तंबु डाला गया। शतपंथ की ऊँचाई १४,४४० फुट, चौड़ाई - ६४० फुट। बद्रीनाथ से २२ कि.मी दूर। चक्रतीर्थ से प्राय: ६ कि.मी। शतपंथ के जल में स्नान कर निर्मल हुआ। दूसरे दिन पुन: यात्रा आरंभ हुई सोमकुंड, सूर्यकुंड की तरफ। आज पुन: वैसा ही मेरुदंड सदृश पथ। पहले की तरह ही धीरे-धीरे अति सावधानी से पथ पर चला। सामने एक छोटा सा झील जिसका नाम 'सत्यपद झील'। वहाँ से और एक घंटे चलने के पश्चात् ही आता है सोमकुंड। हिम विगलित जल परन्तु अल्प परिमाण में। कुंड छोटा, परन्तु परिधि प्राय: चालीस फुट। प्रकृतपक्ष में यह आर्तेजिय कूप (Artesian Well) है।

चंद्र के ह्रास-वृद्धि के अनुसार कूप का जल भी घटता-बढ़ता है। अमावस्या को संपूर्ण जल शून्य हो जाता है एवं पूर्णिमा को जल परिपूर्ण हो जाता है। सोमकुंड से एक घंटे चलने पर आता है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड पीछे छोड़कर आगे चला। सामने कुछ दूरी पर गगनचुंबी पर्वतश्रेणी। हिमवान महाशैल। इसीका नाम बद्रीनाथ पर्वत। सर्वेक्षण नक्शों के अनुसार चौखम्बा। इसके एक तरफ से शतपंथ हिमवाह बह रही है, दूसरी तरफ उतर आया है गंगोत्री हिमवाह। इस पर्वत के पहाड़ी रास्ते से होते हुए 'मद्-महेश्वर' पर उतरा जा सकता है। दूसरे एक पथ से केदारनाथ भी जा सकते है। इस हेतु पर्वत आरोहण का विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है और उस के साथ अनुभव, सरोसामान एवं साहस की आवश्यकता होती है। आगे की ओर हाथ दिखाकर भूपिन्द्र बोल उठा देखिए स्वर्गारोहिणी। देखने पर पाया सचमुच हिम आवृत पर्वत से सटकर एक के बाद एक तुषार निर्मित सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पर्वत के शिखर से टूटा हुआ बर्फ का स्तूप एक के बाद एक तल पर नीचे की तरफ आ रहा है। लगता है कि हिमप्रपात के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। किसी हिमवाह के स्वाभाविक निम्नमुख पर एकत्रित तुषार के पथ की तरह। दूर से यह सीढ़ियों की तरह दिखाई दे रहा है। तुषार शिखर से धवल मेघपुंज पवन में तैरते हुए नील आकाश में उड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही मेघों के मध्य अंतर्हित हुआ था स्वर्ग का रथ।

स्वर्गारोहिणी

अब लौटने की बारी है। धीरे-धीरे उतर आया शतपंथ के पास। उस जगह से फिर चक्रतीर्थ। एक रात चक्रतीर्थ में विश्राम कर लौट आया लक्ष्मीवन। वहाँ से फिर मानाग्राम। उतर कर देखा मानों नीचे प्रलय हो गया है। ऊपर वैसी बरसात नहीं होने पर भी नीचे प्रबल वृष्टि से रास्ता बंद हो गया है। बद्रीनाथ-ऋषिकेश हाइवे (उच्च पथ) पर जगह-जगह पर भू-स्खलन हो गया है। अनिश्चित समय के लिए गाड़ियों का चलना बंद हो गया है। मैंने भारत सेवाश्रम संघ के अतिथि निवास में आश्रय लिया। रात में हठात् फोन आया, आश्रम से शिवदा (स्वामी सदाशिवानंदजी) थे, "तुम तो रुद्रप्रयाग में नहीं हो", माँ के साथ बात करो। शिवदा से फोन लेकर माँ ने अति मधुर वार्तालाप किया - "इतनी दूर जब जाना था तो मुझे सूचित कर जाना चाहिए। मुझे एकबार बताकर जाते तो व्यासपीठ भी देख आते। तुम तो व्यासपीठ के निकट से ही गुजर गए।" मेरे मन में तब ये बात आई कि माँ को न बताकर आने पर मैंने कितनी बड़ी भूल की है। जो भी हो माँ के निर्देशानुसार ही दूसरे दिन ही एक विशेष गाड़ी से हरिद्वार उतर आया। वहाँ से पुन: कोलकाता। घर लौटकर तुरंत आश्रम की ओर भागा। माँ के मुख पर वही स्मित मुस्कान खेल रही थी। "सकुशल लौट आया तो!" – बड़ा मधुर और बड़ा अपनापन भरा वे सारी बातें थी माँ की।

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

-- **समाप्त** --

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (५८) : श्रीश्रीमाँ के संबंध में :– बापीदा गुरु महाराज के अर्थात् श्रीश्रीलाहिड़ीबाबा के दक्षता प्राप्त क्रियावान सन्तान थे। बापीदा जब मध्यरात्रि में योग की

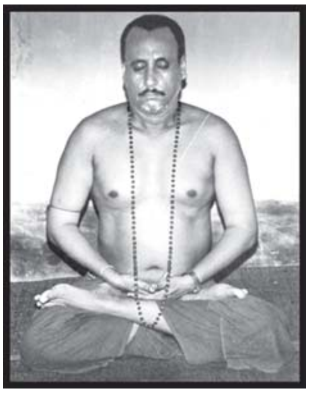

अवस्था में निमग्न रहते थे, तब उस अवस्था में कूटस्थ में दर्शन के माध्यम से उनके समक्ष अनेक सत्य प्रकाशित होते। वर्ष २०१६ जनवरी महीने की पाँच तारिख को हुए महादर्शन का विवरण एवं भाव बापीदा के ही शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ–

''सम्भवत: तब रात्रि के तीन बजे होंगे। मैं गुरुभाव में (श्रीगुरु की चिन्ता में मग्न अवस्था में) क्रियायोग में साधनरत था, तब मैंने दर्शन में स्पष्ट देखा, मैं अखण्ड महापीठ में आयोजित एक अनुष्ठान में गया हूँ; हॉल में माँ के भक्तों एवं शिष्यों का समागम था। मुझे श्रीश्रीमाँ ने 'गुरु' के संबंध में बोलने के लिए कहा तो मैं बोलने लगा - 'देखिए यहाँ पर माँ के छोटे-बड़े तथा उम्र वरिष्ठ भक्त एवं शिष्यवृन्द जो उपस्थित है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप ही ऐसी आद्याशक्ति माँ आपलोगों को मिली है; जिस महाशक्ति माँ को पाने के लिए ऋषि-मुनियों को वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है उस माँ को आप लोगों ने पाया है। इस माँ की सिर्फ भक्ति या श्रद्धा करने से ही नहीं होगा, माँ को अपने हृदय के मध्य इस प्रकार स्थापन करना होगा कि लगे जैसे माँ को नरम रूईं के मध्य रखा हो ऐसे कि माँ की देह के किसी अंश को कोई आघात न लगे; किसी मुहूर्त में यदि माँ सामने चलते हुए थोड़ी असंतुलित हो जाय, साथ-साथ अपनी पीठ द्वारा माँ को सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। आप लोग और एक बात अच्छे से जान कर रखिए साधारणतया कहा जाता है कि गर्भधारिणी माँ का स्थान सबसे उच्च होता है एवं उसके पश्चात् गुरुमाँ - बात एकदम सत्य है, किन्तु थोड़ा सोचकर देखें तो पायेंगे कि गर्भधारिणी माँ केवल अपनी सन्तान के लिए, केवल अपनी सन्तान के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझती। लेकिन गुरुमाँ सभी के मध्य हैं, सभी उनकी सन्तानें हैं। उनसब सन्तानों के कष्टों के समय अपनी गर्भधारिणी माँ के सदृश ही सूक्ष्मदेह में सर्वदा ही सन्तानों के समीप उपस्थित रहती हैं। –और एक अन्तिम बात निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुमाँ (श्रीश्रीसर्वाणी माँ) को देहबोध के रूप में देखने से आप लोग माँ की कृपा से अनेक दूर रहेंगे। श्रीश्रीमाँ देहबोध से अलग है। किन्तु माँ का जब आद्याशक्ति अन्नपूर्णा होकर धरित्री पर आगमन होता है, तब भक्त के अनुभव में माँ दशभुजा दुर्गा होकर 'नारी' शक्तिरूप धारण करके आती है।''

श्रीश्रीमाँ ने सब सुनते हुए कहा –''प्रदीप, जब कोई किसी सत्य का दर्शन करता है तब सद्गुरु आत्मगुरु होकर उस सत्यद्रष्टा के मानस पट पर इसी प्रकार सत्य के रहस्य की प्रत्यक्ष उपलब्धि कराते हैं। सभी उस सद्गरु की कृपा है समझना।''

प्रसंग (५९) : श्रीश्रीबाबा की दीनहीन मनुष्यों के प्रति अपार करुणा :– एक दोपहर (सम्भवत: १२:३० से १ के मध्य का समय) बाबा के पास जाकर देखा बाबा अपनी उपस्थित संतानों को कह रहे थे कि, ''तुम लोग दिवाल के कोने के पास रखे आमों को एक एक करके ले लो और घर में ले जाकर सब मिल कर खाओ।'' देखा! बाबा के कक्ष के एक कोने में एक गठरी में आम रखे हुए हैं एवं उपस्थित लोग बाबा के आदेशानुसार एक-एक करके आम वहाँ से निकाल कर ले जा रहे थे। मैं (बापीदा) यह घटना देखकर अवाक् हो गया। वहाँ उपस्थित असीमदा से इसका कारण पूछने पर उन्होंने हँसते-हँसते कहा कि, ''कुछ समय पहले एक वृद्ध अपने कंधों पर आमों का बोझा लेकर आगे बढ़ रहा था चलते-चलते बाबा के घर के समीप आते ही बाबा बोल उठे, 'बेचारे की इस भरी दोपहर में एक भी आम की बिक्री नहीं हुई। तुमलोगों में से कोई एक व्यक्ति पूरी गठरी लेलो।' बाबा के कहे अनुसार वहाँ उपस्थित शिष्यों में से किसी एक ने उस वृद्ध से समस्त आम ही खरीद लिए एवं उससे पूछने पर पता चला कि सचमुच उसदिन उसका एक भी आम बिक्री नहीं हुआ था। वृद्ध व्यक्ति घर के दरवाजे से कृतज्ञतापूर्वक बाबा को प्रणाम करके चला गया।'' इस अद्भुत दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि दीन गरीब के प्रति बाबा की कितनी असीम करुणा थी। कुछ लोगों का सोचना था कि, इसप्रकार बाबा ने हमें अमृत रस का पान कराया।

प्रसंग (६०) : बहाने बनाकर कोई महत् कार्य नहीं होता:– बाबा के क्रियावान शिष्य घोषालदा के मुखनि:सृत एक घटना को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। ''एकबार मेरी (घोषालदा) परिवार के साथ विंध्याचल जाकर 'विन्ध्येश्वरी देवी' का दर्शन करने की मनोकामना जाग्रत हुई। इस परिप्रेक्ष्य में लाहिड़ीदा (घोषालदा बाबा को लाहिड़ीदा कहकर सम्बोधन करते) से अनुमति माँगने पर उन्होंने कहा, 'घोषालदा, आप मेरी पूजा भी विन्ध्येश्वरी माँ को अर्पित कर दीजिएगा।' तत्पश्चात् मैंने विन्ध्याचल में जाकर विन्ध्यवासिनी माँ को पूजा करने के लिए पर्वतों की गोद में अवस्थित मन्दिर में जाने हेतु लाईन में खड़ा हुआ। अत्यंत विस्तीर्ण लाईन में खड़ा था। मैं कुछ देर तक तो खड़ा रहा फिर मैंने अपना धैर्य खो दिया। हठात् देखा कि मन्दिर में एक छोटी खिड़की की तरह एक जगह है वहाँ से विन्ध्यवासिनी माँ को देखा जा सकता था। अर्थात्, लाईन तो बहुत घूम-घूम कर मन्दिर जा रही थी किन्तु मेरी जगह से उस खिड़की में से स्पष्ट रूप से 'माँ' का दर्शन किया जा रहा था, मैंने सोचा कुछेक घण्टों यहाँ खड़े रहने से अच्छा है यहीं से सीधे-सीधे 'माँ' की पूजा कर दूँ; यही सोचकर मन्त्रपाठ करते हुए मैंने अपनी एवं लाहिड़ीदा की पूजा अर्पित कर दी। उसके पश्चात् मेरे घर लौटकर लाहिड़ीदा के साथ भेंट कर उन्हें पूजा के संबंध में बोलने से पूर्व ही लाहिड़ीदा बोल उठे, 'घोषालदा आपके द्वारा की गई पूजा निष्फल हुई। दो से तीन घण्टे का समय और लगता, आप लाईन में खड़े रहकर भक्तों के साथ धैर्यता रखते हुए पूजा करते वह ना करके आपने छल से कार्य हासिल करना चाहा। अतएव इस प्रकार की पूजा को माँ ने ग्रहण नहीं किया। ऐसी जगहों में जल्दबाज़ी से काम नहीं बनता। – अन्तर्यामी लाहिड़ीदा के चरणों के समीप बैठते हुए मैंने अपनी भूल के लिए क्षमा माँगी। उन्होंने कुछ क्षणों के बाद ही स्मित मुस्कान के साथ कहा, 'घोषालदा, मन खराब मत कीजिए', तत्पश्चात् मुझे उत्साहित करने के लिए कहा, 'माँ तो सर्वत्र ही है'।'' *...क्रमश:*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

भगवत् कथा

शिवात्मजा नर्मदा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

एकबार भगवान शिव चराचर जगत् के कल्याण की कामना हेतु ऋक्ष पर्वत पर अरोहणपूर्वक सर्वप्राणियों से अदृश्य होकर उमा के सहित कठोर तपस्या की। उस तपस्या काल में शिव के देह से जो स्वेद निर्गत हुआ उससे एक नदी का उद्भव हुआ। वह नदी ही थी नर्मदा। यह नर्मदा नदी शिव-आत्मजा स्वरूप हैं एवं शिव से वर प्राप्त कर वे सर्त्वोजिता गंगा के तुल्य पूजनीया एवं सर्वावस्था में पवित्र है।

कल्प के अन्त में जब समुदय जगत् जलमग्न हो गया था तब भगवान हर निखिल जगत् को उदर में धारण कर प्रकृति के क्रोड़ में शायित हुए। इसी अवस्था में उनके सहस्त्र युग अतिवाहित हो गये। इस समय शिवकन्या नर्मदा शंकर के पादमूल में अवस्थान कर उनके पदसेवा में नियुक्त थी। ब्रह्मादि देवगण महेश को इस प्रकार निद्रित अवस्था में दर्शन कर तब वेदचतुष्टय के द्वारा परम भक्तिभाव से उनका स्तव करने लगे। इस प्रकार स्तव करते-करते हठात् वेदचतुष्टय प्रलय पयोधिजल में विलीन हो गये। वेदों के जलधिजल में निमग्न होने पर पितामह ब्रह्मा भी अज्ञान-अंधकार में विलीन हो गये। तब महादेव को प्रबुद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने उनका स्तव करना प्रारम्भ कर दिया। ब्रह्मा के स्तव और आराधना से प्रबुद्ध होकर शंकर निद्रा से उत्थित हुए एवं पाश्ववर्ती नर्मदा से वेद लुप्त होने का कारण जिज्ञासा किया। नर्मदा ने शिव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि महेश जब निद्रित थे तब मधु और कैटभ नाम के असुरद्वय वेदपाठ में निरत ब्रह्मा के निकट से वेदों का अपहरण कर सागर के जल में छिपे हुऐ हैं। नर्मदा की बात सुनकर शिव ने विष्णु का स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही भगवान विष्णु ने मीनरूप धारण कर जल में निमग्न होकर पाताल से वेद आहरण कर ब्रह्मा को प्रदान किया। देवादिदेव महेश की एक मूर्ति ही प्रयोजन अनुयायी त्रि-गुणान्वित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप में समस्त कार्यों का सम्पादन करती है। ब्रह्मादि के सदृश गंगा, रेवा और सरस्वती भी उस रुद्र से ही समुद्भूता है। गंगा उनकी वैष्णवी मूर्ति, नर्मदा शैवी मूर्ति एवं सरस्वती उनकी ब्राह्मी मूर्ति है। *(विभिन्न पुराण से संग्रहित)*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४९ :'गायत्री' क्या है और गायत्री मंत्र का तात्पर्य क्या है?

उत्तर : गायत्री मन्त्रार्थ का संक्षिप्त सार –'गायत्री' प्रधानत: एक वैदिक छन्द है एवं इस छन्द में ही गायत्री मंत्र रचित है। ऋग्वेद का यह विख्यात मंत्र है – 'ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्।।' — विश्वामित्र ऋषि इस मंत्रवर्ण के द्रष्टा हैं इसीलिए वे ही इस मंत्र के ऋषि है। यह मन्त्राधिष्ठात्री देवता हुए सविता सूर्य, जो जगत् के प्रसविता, सृष्टि, स्थिति और लय के कर्ता, सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म। यह मंत्र प्राणायाम के साथ प्रयोग किया जाता है। वृहदारण्यक उपनिषद में जगत् में सब पर प्राणशक्ति ऊर्ध्वायण प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि गायत्री प्राण के मध्य प्रतिष्ठित है। 'गय' अर्थात् प्राण समूह को त्राण करना है इसीलिए इसका नाम गायत्री है। फिर छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है इस दृश्यमान जगत् के जो कुछ पदार्थ है वे समस्त ही गायत्री स्वरूप हैं। वाक् या शब्द ही गायत्री, वाक् ही इस समस्त प्राणीजगत् का गान करता है एवं वाक् ही समस्त प्राणियों को अभय प्रदान कर त्राण करता हैं। इसीलिए गायत्री मंत्रसाधन करनेवालों को कहा गया है कि सटीक उच्चारण द्वारा गायत्री पाठ कर सकने से गायत्री साधक का त्राण करता है। मूल गायत्री मंत्र के दो अंग है – व्याहृति एवं शिर (शिर:)। जिसे अति यत्न के साथ आहरण किया जाता है, उसे व्याहृति कहा जाता है अथवा जिसे खूब यत्न सहित उच्चारित करना पड़ता है, उसे भी व्याहृति कहा जाता है। भगवद्गीता में ओंकार उच्चारण प्रसंग में एक श्लोक भगवान ने कहा है — "ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।" इस प्रसंग में आदि शंकराचार्य ने कहा है — प्रणवयुक्त अर्थात् ओंकार उच्चारण संयुक्त व्याहृति युक्त एवं शिरोयुक्त गायत्री ही समस्त वेदों का सार है। प्रणव, व्याहृति एवं शिरोयुक्त गायत्री का रूप हुआ — 'ॐ भू:, ॐ भूव:, ॐ स्व:, ॐ मह:, ॐ जन:, ॐ तप:, ॐ सत्यं, ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात् ॐ आपोज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्' — इस सप्तव्याहृति गायत्री मंत्र एक पूर्णरूप होने पर भी गायत्री जप के समय प्रधानत: तीन व्याहृति उच्चारित होते हैं, जिन्हें 'महाव्याहृति कहा जाता है। जप करते समय गायत्री शिर के स्थल पर सिर्फ 'ॐ', ओंकार ही व्यवहृत होता है। तीन महाव्याहृति एवं ओंकारयुक्त गायत्री जप की साधना प्राचीन युग से प्रचलित है यह विषय मनुसंहिता में मिलता है।

गायत्री के सप्त-व्याहृति वास्तव में हैं इस ब्रह्माण्ड के सप्तलोक, प्रत्येक लोक ही सगुण ब्रह्म के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण देह के विभिन्न प्रदेश है। ये लोकादि उस-उस प्रदेशसुलभ ज्ञान की विकास भूमि एवं आत्मज्ञान के क्रम निर्देशक हैं। भागवत पुराण अनुसार, यह सप्तलोक भगवान के सर्वव्याप्त समष्टि देह के सप्त आवरण है। गायत्री मंत्र के मध्य गायत्री – शिर "ॐ आपो ज्योति रसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्" – इसका अर्थ हुआ – 'आप:' अर्थ से व्याप्ति को समझना होगा, 'ज्योति' अर्थ से प्रकाश रूप, 'रस' का अर्थ सर्वातिशायित्व सर्वोत्कृष्टता, 'अमृत' अर्थात् मरणादि संस्कार विमुक्त एक विशुद्ध बोध की अवस्था समझायी गयी है। शंकराचार्य के मतानुसार गायत्री शिर का अर्थ हुआ – सर्वव्यापी, सर्वप्रकाशक, सर्वोत्कृष्ट, नित्यमुक्त सच्चिदानन्द जो ओंकार वाच्य ब्रह्म, वही है 'मैं' अर्थात् मेरी आत्मसत्ता गायत्री का शिर गायत्री की मुकुटमणि; अर्थात् साधना की क्रमधारा में स्थूल अन्नमय कोष का अहंकारी जीव अप:तत्त्व एवं तेज:तत्त्व के स्थूलांश निर्मित मनोमय कोष में उत्तोलित होने के लिए आरंभ में प्रार्थना करता है। तत्पश्चात् तेज:तत्त्व के सूक्ष्मांश ज्योतितत्त्व निर्मित विज्ञानमय कोष में उत्तोलित होकर स्थित होने के लिए प्रार्थना करता है। अवशेष में उससे भी सूक्ष्मतर रसमय आनन्दमय कोष में उपनीत एवं स्थित होने के लिए प्रार्थना करता है। इसके पश्चात् सूक्ष्मतम हिरण्मय कोष में अर्थात् जिसे दहर कोष कहा जाता है, उस हिरण्मय दहर कोष में चित्स्वरूप के अमृत मध्य स्थापित होने के लिए योगी प्रार्थना करता है। वास्तव में इस क्षुद्र 'मैं के जीवरूपी बिन्दु को ब्रह्म सिन्धु में मिलाकर जीव ब्रह्म के एकात्मकरण साधित होने के लिए समर्पित सत्ताबोधि के प्रार्थनारूप व्याकुलता से जीव ब्रह्म के 'एकात्मक' होने का मंत्र ही 'गायत्री – शिर'। महासाधक रामप्रसाद की भाषा में–"सिंधु में माँ का बिन्दुरूप छिटक्कर गिरता है मानों माणिक्य स्वरूप।"

—यह अवस्था ही चिद्भूमि की चेतना की सम्बोधि है।

—हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आश्रम समाचार

१०-१९ अक्टूबर – इसबार आश्रम की २७ वीं नवरात्रि व्यापी दुर्गापूजा अनुष्ठित हुई। नित्य पूजा, यज्ञ और भोग-प्रसाद वितरण का आयोजन प्रति वर्ष की तरह इस बार भी सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ। पंचमी के दिन सुबह से श्रीश्रीमाँ के कर-कमलों से पाँच सौ से अधिक ग्रामवासियों को वस्त्र वितरण किए गए। वस्त्र के साथ मिठाई एवं बिस्कुट के पैकेट भी प्रदान किए गये। इस दिन संध्या में पण्डित श्रीगिरिधारी नायक के 'उड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों द्वारा एक मनोरम नृत्यानुष्ठान प्रस्तुत किया गया। हिरण्यगर्भ की पूववर्ती संख्या का भी विमोचन हुआ। सप्तमी के पावन संध्या पर श्रीश्रीमाँ के साथ गुरुभ्राता और भगिनियों ने श्रुतिमधुर संगीत का परिवेशन किया। इसी दिन नृत्य भी प्रदर्शित किए शिशु कलाकारों समाद्रिता बासु, विदिशा साहा और श्रद्धा दासगुप्ता ने। महाष्टमी तिथि के अवसर पर श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ीबाबा के तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य पर भण्डारा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन समागत अनेक भक्तों के मध्य श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद वितरण किया गया।

२४ अक्टूबर – श्रीश्रीकोजागरी पूर्णिमा में श्रीयज्ञनारायणदा के पौरोहित्य में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की आराधना और यज्ञ बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुए।

४ नवम्बर – इस दिन सुबह श्रीश्रीमाँ ने अगणित दरिद्र ग्रामवासियों के मध्य वस्त्रादि वितरित किए। वस्त्र के साथ प्रत्येक को मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किये गये।

६ नवम्बर – हमेशा की तरह दीपावली के पर्व पर आश्रम में मनोहर रंगोलियों और मोम-बत्तियों की आभा एक अलग सा सौन्दर्य प्रदान कर रही थी। अमानिशा की मध्यरात्रि में श्रीश्रीमाँ ने अपने ही आश्रम में प्रतिष्ठित देवी ताराकालिका की पूजा की।

१८ नवम्बर – इस दिन जगद्धात्री पूजा के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीअन्नपूर्णा मंदिर में भोग निवेदित हुआ।

२३ नवम्बर – रासपूर्णिमा के दिन श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण हुआ। इस पुनीत संध्या पर श्रीश्रीमाँ ने कई अपूर्व भजन प्रस्तुत किए।

२५ नवम्बर – इस दिन प्रातःकाल श्रीश्रीमाँ ने ग्रामवासियों को कम्बल तथा शीतवस्त्र साथ में मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किए। संध्या में अखण्ड महापीठ माता सर्वाणी ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा अनुष्ठित हुई।

१-८ दिसम्बर – श्रीश्रीमाँ ने कुछेक भक्तसह वाराणसी के आश्रम में बिताया। इस समय एकदिन श्रीश्रीमाँ नैमिषारण्य भी गयी थी।

१५-१६ दिसम्बर – १५ दिसम्बर अखण्ड महापीठ के भक्तनिवास और अन्नपूर्णाक्षेत्र में मन्दिर प्रतिष्ठा दिवस पर प्रातःकाल की मंगल बेला में पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। कुमारी भोजन में श्रीश्रीमाँ ने बच्चों को निज-करों से प्रसाद वितरण किया। संध्या में भजन-संध्या का आयोजन भी अन्नपूर्णाक्षेत्र में ही किया गया। १६ दिसम्बर में प्रातःकाल 'श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीऊ' की पूजा-अर्च्चना और भोगप्रसाद वितरण संपन्न हुआ।

२५ दिसम्बर – इस दिन संध्या में आध्यात्मिक सभा के २९ वें पर्व पर कठोपनिषद् पर गुरुभ्राता डा. वरुण दत्त ने एक अपूर्व व्याख्यान प्रस्तुत किया।

२८ दिसम्बर – अखण्ड महापीठ के प्रांगण में श्रीश्रीमाँ सारदादेवी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर होटोर की महिला और शिशु आश्रम की छात्राओं ने श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। पहले आश्रम के गुरुभ्राता और भगिनीगणों ने एक मनोरम संगीतानुष्ठान परिवेशित किया। तत्पश्चात् होटर आश्रम की शिशुशिल्पियों ने एक मनोरम सांस्कृतिक अनुष्ठान परिवेशन करके दर्शकों का मनोरंजन किया। द्वितीय-पर्याय में श्रीअभयजी के कन्या परिपूर्णा देवी ने अभयजी रचित कुछ अपूर्व गानों का पीरवेशन किया।

३० दिसम्बर - इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विषय पर प्रवचन दिया।

आगामी अनुष्ठान सुची

होली - २१ मार्च, गुरुवार
अध्यात्मिक सभा – २४ मार्च, रविवार
अन्नपूर्णा पूजा – १३ एप्रिल, शनिवार
राम नवमी – १४ एप्रिल, रविवार
प्रथम बैशाख – १५ अप्रेल, सोमवार

Vishnu Avatar Dattatreya Bhagwan

Sree Sree Maa Sharbani

Rishi Dattatreya, a great yogi saint is revered for his unique tapasya, foundational contributions to the development of Vedanta, Yoga, Aghora philosophies and loved for his mild and gentle nature. His teachings have influenced several major sects and individuals. A large number of self-realized saints from early days to modern times owe philosophical and spiritual lineage to the great 'Datta-Bhagwan'. He was born in the family of Brahmarshi Atri and Devi Anusuya after their prayers to Lord Narayana bore fruit. The Lord appeared before his parents and blessed them saying that he will appear as their son, as the sixth avatar of Lord Vishnu (in the original series of Vishnu's twenty-two avatars). Thus he was christened as 'Datta' or one received as a gift (to the Atreya clan), and his full name was Dattatreya. He is also said to be three headed, representing the trinity of Brahma-Vishnu-Shiva. His realization was Supreme.

Dattatreya Bhagwan

There is another interesting legend of his birth. His mother, Devi Anasuya was a highly spiritual personality of immaculate purity. Once, in order to test her, the trinity appeared before her in the guise of Brahmins. When she came forward to respectfully wash their feet, they declined and asked her to be affectionate to them like she would with children. Seeing through their plan through her yoga-purified eyes, Devi Anusuya then took some water sanctified by her husband Sage Atri and sprinkled it on them saying, 'become like children'. Immediately they became six-month old babies and she fed them milk like a mother. They were then restored to their original forms. Amazed at her greatness, they asked her to seek a boon. She requested them to be born as her children. Thus was born to them three sage children, Som, Dattatreya and Durvasa from boons of Brahma, Vishnu and Shiva.

From an early age Dattatreya took up deep spiritual practice. Being an avatar, he was an adept from the beginning and thus did not require a formal guru for enlightenment to dawn in him. Satwik-guna of Lord Vishnu was highly ingrained in him and he would look for important qualities in everything to innately gain knowledge. His approach is immortalized in his interaction with a king, who watching him walk around immersed in bliss like an intoxicated gentle elephant, asked him, "From where (implying from whom) have you received this great treasure that is reflected in the happiness of your being?" To this Rishi Dattatreya replied, "Everyone's Guru is their atma or soul and through direct and indirect realization, this self-realized knowledge brings them true benevolence. O King, I have not made any single person my Guru. I have intelligently observed good qualities in different entities around me and have imbibed them in my personality. All of them are therefore my Gurus. This way I have twenty-four principal Gurus." He then went on to relate these as is summarized below: " O King, (1) The Earth is my first Guru. It steadfastly performs its duties of providing

for others even when abused and keeps healing without a complaint. From this Mother Earth I have learnt that a sadhak must have forbearance, ability to forgive, continuously heal oneself and remain always helpful to others. (2) Water is my second Guru. It is transparent, cleans everything without discrimination and ego, remains gentle and gives life to what it touches. From water I have learnt that a sadhak needs to remain transparent, pure, clean, gentle and non-discriminative. My third Guru is (3) Fire. Fire consumes everything that is given to it and converts it to pure ash. Thus I learnt that a sadhak should receive only what it can properly consume and should use the fire of the body, mind and spirit to reform what is received to its pure form of knowledge. (4) Wind is my fourth Guru. Wind passes through everything but remains free and unattached like Truth, yet can use its force and power to bring about change. From wind, I have learnt how a sadhak's spirit needs to not only be free and unattached, but also amenable to using its latent inner strength to bring about a transformation in its own being for the sake for truth-realization. The (5) Sky is my fifth Guru. It effortlessly bears the sun, moon, stars, in its limitless expanse and yet remains unaffected and unattached to them irrespective of their movements and interactions whether it is sunshine, rain or thunderstorms. From the sky I have learnt how a sadhak can get a glimpse of the infinite witnessing soul that is the mainstay of all existence but remains unaffected by all that goes on in its ambit. To learn how to become one with the invisible universal being, I have made the Sky my Guru. The (6) Moon is my sixth Guru. The moon always remains the same in its real form. Its waxing and waning are due to shadows in its surface as seen from the earth. From the moon, I have learnt that the soul remains full and unchanged even if it appears to others to grow and shrink across various cycles. My seventh Guru is the (7) Sun. The pure rays of the sun touch every material element, as part of its duty but never get attached to the material or its purity sullied by it. It draws water from a puddle to the sky and then releases it. Similarly a sadhak should realize that the same source of light emanates from the soul of every being and he or she should remain connected to the inner light and its source but not be attached to the material elements the light may touch as part of its duty.

O King, I learnt a lot about succumbing to momentary emotion from my eighth Guru, the (8) Pigeon. A pigeon and his wife lived high up on a tall tree. Soon they had children. To make room for the children, they came lower down in the tree to live more comfortably. One day a hunter, seeing the little ones at a reachable height, cast his net and trapped them. The mother pigeon, seeing this decided to go to the children and dived into the net. The pigeon now became very emotional and also dived into the net and all perished. O King, from the pigeon I learnt not to seek material lavish and thereby move closer to being preyed. So a sadhak needs to maintain a proper distance from the clutches of bondage. I also learnt that one needs to be unattached to the transient emotions of others as it may take a sadhak away from the path of enlightenment in a momentary fit of emotional outburst.

I learnt steadfastness and contentment from my ninth Guru, the (9) Python. The python stays in one place, is unperturbed for material needs, eats whatever comes its way by divine providence, does not spend time gathering for future material needs, remaining contented in self-existence. From a python a sadhak learns contentment with what is provided and steadfastness in pursuit

of self-realization, without running around here and there. The (10) Ocean is my tenth Guru. Multitudes of rivers and streams with their varied waters enter the ocean, but the ocean remains unperturbed, remaining calm and steady in its depths. Similarly, a sadhak needs to be submerged in the ocean of self-contemplation, without being unduly disturbed by the rivers of sensory inputs that flow into it. My eleventh Guru is the (11) Bumblebee. It moves around discriminately from flower to flower collecting honey but does so in harmony with the flowers. From the bumblebee I learnt how a sadhak can use discrimination to seek knowledge from all sources, but collect only the nectar, the core and assimilate it. It also teaches us to be harmonious with all variants of fragrances of paths leading to the ultimate goal.

On the other hand, the (12) Beekeeper, my twelfth Guru, taught me to avoid craving for piling up treasures for material gains by capturing free elements and extracting their wealth. None of them lasts and its repercussion may often be the cause for one's own destruction. The (13) Moth is a classic example of being deceived by the senses and jumping into the flame thinking it is some illuminating light. From the moth, my thirteenth Guru, I learnt that a sadhak is to be alert not to be fooled by sensory illusions as it may cause destruction. The lustful (14) Elephant is my fourteenth Guru. Drawn by desire of the scent of its mate, I saw an elephant run blindly without checking the path and fall into a trap pit. From this Guru I learnt that lust makes you blind of everything else including the goal and is the cause of an eventual fall from the path of sadhana. I saw a (15) Hawk and from its actions, I made the hawk my fifteenth Guru. The hawk flies high but its mind is always on the ground, looking for food. I observed how a hawk dived down and took a large piece of meat, much more than its need. As it flew high, others attacked it for the food and in the fight tore the meat to pieces, all dropping down, leaving the injured hawk little for its own consumption. Peace reigned only when the fight for food was over. The hawk taught me not to be swayed by material things from the height of a meditative mind, not to take more than needed and that peace is attained only when you leave aside objects of desire. The (16) Deer is my sixteenth Guru. I saw a deer being frightened by hunters beating their drums and scaring it to a waiting trap net. From the deer, I learnt not to be swayed by internal or external commotions and circumstances created by others. This will only cause one to lose their path. The greedy (17) Fish is my seventeenth Guru, O King. It succumbs to a bait of crumbs externally planted in the water when there is so much healthy fodder available in its own surroundings given by nature. The fish teaches a sadhak to be aware of falling into the death trap of greed.

The (18) Courtesan named Pingala is my eighteenth Guru. I learnt the transformational path from dejection of material pleasures to enlightenment from her. She would dress up to receive her customers, whom she assumed loved her. One day, while she waited, none came. She realized that all her external beauty for which she had even given up her self-respect to attract others was actually meaningless and did not serve her own good. This dejection led her to seek the inner truth. From her, I learnt that dejection from transitory bodily pleasures is the pathway for higher goals, a meaningful life and living. The innocent, curious, blissful (19) Child is my nineteenth Guru. A sadhak should always be like a child, in self-bliss with little wants, easily pleased with love,

always looking to its core (parent or soul) for all needs and brings joy and happiness to its surroundings. My twentieth Guru is the (20) Maiden. She avoids attention, likes to remain in the peace of solitude but is dutiful to her parents and family. I learnt these exemplary qualities that are needed for attaining self-realization from her. The (21) Snake is my twenty-first Guru. It lives in any available lonely place or hole and does not make a home for itself. Likewise a sannyasi sadhak should not get entangled in the pursuit of making brick and mortar homes to live in comfort but be able to live in simple places like temple premises made available for such aspirants. Moreover, a snake is willing to shed its skin to transform itself and rejuvenate. Similarly a sadhak should be able to remold their body and mind for the purpose of attaining the goal of self-realization. The intense concentration of the (22) Arrow-smith to perfect the arrow under making is my twenty-second Guru so that one firing is sufficient for piercing the target. I learnt from him how to perfect the technique of sadhana through concentrated effort so that every attempt through intense dharana enters immaculate dhyan and eventually culminates in samadhi. The (23) Spider is my twenty-third Guru. It taught me how one can carefully remain un-entangled within its own web of mind-spun alternatives, ever prepared to fly away to freedom when this transitory self-created web of the illusory world collapses, ready to move on. Finally my twenty-fourth Guru is the (24) Caterpillar. It patiently embarks on a long journey from a larva to a beautiful butterfly, undergoing many transformations, continuously striving for perfection and willing to undergo many changes of it. Similarly I learnt that a sadhak should patiently pursue the path in a steadfast manner willing to undergo all change that is needed in body, mind and spirit to bring about the magical metamorphosis from an ordinary aspirant to a fully realized spiritual master.

O King, imbibing the above qualities from these twenty-four principal Gurus and making them part of my personality have made me Jeevan-mukt or free even as I live. That is why I am always in bliss as you have noted.” The king on hearing such advice, himself embarked on the path of sadhana.

The sadhana of Sage Dattatreya is etched all over the length and breadth of this land. Even today we have numerous places bearing remembrances of his stay there. They have become pilgrimages. These cover the Girnar and Aravalli hills, banks of the Godavari and Narmada, the Himalayan Mountains including areas near Srinagar and the like. His disciples are legendary giants themselves covering rishis, munis, devas and asuras. They include Kartavirya-Arjuna, Parashurama, Yadu, Haihaya-raj, Prahlad and others. His ambit of contributions covered all angles – Vedas, Vedanta, Yoga and Aghora-Tantra. His ‘Avadhut Gita’ often referred to as the ‘Song of the Free’, is considered an authority on Advaita Vedanta and announces that the experience of ‘Ekamevadwitiyam’ (or One without another) is possible only when in complete Unity with the Supreme Soul. The Atma is the only reality it states. This transcendental reality is revealed as the Universe. In other words, the difference between what is Formless and what has Form disappears forever, and it is co-eternal with the vision of the Universe in Atman. Here are a few gems from the Avadhut Gita:

How shall I salute the formless Being, indivisible, auspicious and immutable, who fills all this with His Self and also fills the self with His Self?

All is verily the absolute Self. Distinction and non-distinction do not exist. How can I say, "It exists; it does not exist"? I am filled with wonder!

I, the One only, am all this, beyond space and continuity. How can I see the Self as visible or hidden?

Union and separation exist in regard neither to you nor to me. There is no you, no me, nor is there this universe. All is verily the Self alone.

Some seek non-duality, others duality. They do not know the Truth, which is the same at all times and everywhere, which is devoid of both duality and non-duality.

Knowing his love for a free Vedantic spirit, it is only natural that the Avadhut Gita was a personal favourite of Swami Vivekananda. This great work is definitely a must read for all aspirants.

This sort of life and living of a self-realized free person is termed that of a Avadhut. An '**A**-vadhut' is one whose is free from the bondage of hope (Asha), whose beginning (Adi) and end (Anta) are infinitely pure (Ananta-nirmal) and is always in bliss (Ananda). An 'A-**va**-dhut' is bereft of all desires (Vasana) and lives in the present (Vartaman) moment always. Again An 'Ava-**dh**-ut' is covered with and mingles with the earth (Dhuli), always immersed in Dhyan and Dharana. Finally and 'Avadhu-**t**', is one who is adept with the Tattwas (foundational principles), one is clean of all Tamas-ego, and who has left behind all attempts to give effort of thought and drive of the ego (Chin-ta, Ches-ta). Again in the Tantric tradition of Aghor, which refers to one being in existence in natural consciousness, an adept who is unwaveringly established in the state of Aghor is called an Avadhut or spiritually realized. In this connection, we may mention that the Tripura Rahasya which expounds the teachings of the supreme spiritual truth beyond the Trinity was delivered to the world by Datta-Bhagwan. The highest truth was first taught by Lord Shiva to Lord Vishnu. Lord Vishnu incarnated on earth as Sri Dattatreya, Lord of the Avadhuts, who taught this to Parasurama, who later taught it to Haritayana. It is mentioned in the Puranas that long before Rishi Patanjali converted it into a set of sutras, Rishi Dattatreya gifted the Ashtanga Yoga to the world. Much of the Natha philosophy is also drawn from the life, works and teachings of Dattatreya Maharaj. His lineage has remained across ages in various forms, especially in terms of self-realized incarnates of the Avadhut tradition on the one side to Vedantins immersed in Bhakti on the other.

Tailpiece: Several sparks of the great Datta-Guru appeared in various ages. Shripad Shri Vallabha is considered the first complete Datta-Avatar in Kali Yuga. He lived in Pithapuram in Andhra Pradesh in the fourteenth century. According to Shri Guru Charitra, the second avatar of Sri Dattatreya in Kaliyuga after Shripad Shri Vallabha was Shri Narasimha Saraswati, who lived in the late fourteenth and early fifteen century in the Vidarbha region of Maharashtra.

With the blessings of Sree Sree Maa, we have had the great privilege of meeting at least two such personalities during their lifetimes, each of them a spark of the great Dattatreya lineage and spiritual giants living relatively low-key lives. The songs of Sri Abhay-ji and the pronouncements of Sri Shiva Teja Baba still ring in our ears, hearts and minds. How similar were their smiles – of a fully realized Avadhut child in illuminated love-emanating bliss !! We bow in reverence before Sri Datta-Guru.

–Translated into English by
Her Blessed Child,
Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(58)

Regarding the Holy Mother:

Bapida is a highly competent kriyaban disciple of Guru Maharajji, i.e Sri Sri Sri Lahiri Baba. Everyday midnight when this Bapida is immersed in his yogic state, he gets an exposition of several facets of truth through his kutastha darshana. On 5th January 2016, one such great exposition and its flavour is explained in the words of Bapida–

Probably it was 3 o'clock at night. I was immersed in Kriya yoga with thorough contemplation on Sri Guru, when I visualized clearly that I visited Akhanda Mahapeeth on some occasion. The hall was full of the disciples and followers of Sree Sree Maa and Maa instructed me to speak something on the topic 'Guru'. I started to speak on this topic and said, "I want to convey all disciples and followers of Maa of all ages who are present here, that you have obtained such 'Adyashakti Maa' through the good deeds of several births. You have obtained that Maa for which the munis and rishis need to go through hard penance. Only devotion to this Maa will not serve the purpose. You need to enthrone Maa gently in the recess of you heart in such a way as if she is placed in soft cotton and her body is protected from all sorts of injury. If Maa momentarily inclines, you need to guard her with your back. I want to make one more point clear – it is said the mother that has given you birth is superior and then comes Gurumaa – this is extremely true. But if you think a while you will see that the mother who has given birth, thinks and understands his own son only. But Gurumaa is within everybody as each one is her son. Like his own mother, Gurumaa has her subtle presence with everybody in their pains and troubles. Finally, you will be far away from Maa's kripa if you look and feel Maa Sarbani from physical standpoint. Sree Sree Maa is beyond the senses of the body. When Maa descends on this earth as Adyashakti Annapurna, then she is projected in the eyes of the devotee as Devi Durga with ten hands; then Maa emerges as the 'female' shakti in the form of Devi Durga."

Sree Maa heard everything and said, "Pradip, when somebody visualizes the tenets of truth, the Sadguru takes the chair of 'Atmaguru' and unveils the mystery of truth in the mental plane of the seeker. All these belong to the kripa (grace) of Sadguru."

(59)

Sri Sri Baba's boundless compassion towards the poor and lowly persons:

One afternoon (probably between 12:30 and 1 pm) I went to Baba and found him speaking to his disciples present, "Each of you take a mango from the corner of the wall, take it to your home and share it with everybody there." I saw a bundle of mangoes at the corner of Baba's room and all the devotees present there picked up one mango each according to Baba's instructions and left the place. I (Bapida) was surprised at this incident and asked the reason of the incident to Asimda present there. He stated laughingly that some time back, an old man was carrying a big load of mangoes on his shoulder and as he approached Baba's door, Baba said, "The poor man could not manage to sell a single mango in this afternoon. Anybody among you go and buy the entire bundle of mangoes." Accordingly, one of the devotees present there purchased the entire bundle of mangoes from the old man and on inquiry he came to know that truly the old man couldn't sell a single mango on that day. The old man, out of gratitude, paid his obeisance to Baba from the gate

of the house and left. This incident highlights Baba's immense compassion for the poor and the down trodden; on the other hand few of the devotees explained that Baba acted thus so that the devotees can drink the nectar.

(60)

No noble work is possible by way of deception:

An incident narrated by Ghoshalda, one of Baba's kriyaban disciples is as follows:

I (Ghoshalda) had a desire to have the darshan of 'Vindeswari Devi' with my family at Vindyachal. Accordingly I went to Lahirida (Ghoshalda used to call Baba as Lahirida) for permission who said, "Ghoshalda, please confer my puja also to Vindeswari maa." Then I went to Vindyachal and stood in the queue for conferring puja to Vidyavasini maa, in the temple, located in the pocket of the mountain. Nearly 300 devotees were waiting in the queue. The long line went twisting along the bends of the mountain and ended in the temple. After standing for sometime I became impatient. Suddenly I saw that there was an open window-like aperture in the wall of the temple, through which Vindyavasini maa was visible. The line of devotees went in a round about way to the temple but I could see 'maa' diagonally from my position in the line. I thought instead of waiting for hours together, it is better that I confer my puja through that aperture. Then I chanted mantra and conferred the puja of myself and Lahirida at the holy feet of the mother. When I came back, I went to Lahirida and before I could tell him the details of our puja he stated, "Ghoshalda your puja was futile. You should have given the puja after waiting for several hours in the line with the other devotees. But you tried to win the game through deception. Hence I am not accepting your puja as in these cases triumph cannot come this way." I sat at the holy feet of the omniscient Lahiri Baba and regretted for my mistake. After some time, he smiled and said, "Ghoshalda, do not be morosed." Then to encourage me he said, "Maa is omnipresent." *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

The mahatma continues:

It is said in the Shiva samhita that "it is only vishesa darshan which dissolves ignorance and without this visesha darshan one cannot destroy the root of ignorance. When the oyster is mistaken for its silver colour, it is visesha knowledge itself which can remove the ignorance and project the oyster as oyster and not as silver." Until the knowledge of truth dawns with the culmination of self-knowledge, the manifold objects of the world will erroneously appear to be 'real'. Once true knowledge or direct wisdom dawns in from atma-sakshatkara, only then a person becomes successful in delineating the falsehood of this world. This visible world is the flow of imagination of our mind – this is directly perceived by us. Hence always remember that the reflected image is present in the mirror and not outside it, similarly the world is the reflection in the mirror of our mind and not outside it.

My son! It is because of the mirror the reflected image is seen, which is distinct from your body; without the mirror this is not possible and then you can only see yourself with the knowledge 'I am.' Similarly, it is because of the reflection through your mind that the virtually non-

existent world is visible to you, separate from you. When your mental mirror is absent, (i.e. when the hesitating mind passes into deep sleep of sushupti) you cannot see a world which is distinct from you. Then you cognize yourself with the feeling 'I am'. Hence it is clearly proved that during sushupti, the mental projection of the mind that is the desire and doubt function of the mind being absent, the world is not visible as a separate entity. The mind then is immersed in the self and is in great peace. Thus it is doubtlessly proved that the function of mind in the form of desire and doubt is present in only the two states of consciousness – waking and dream state and hence the world is visible in these states and not in the states of sushupti and turiya.

My son, now think how your clever and sly mind has put you in the unending pain and infernal sorrow by falsely projecting the false as truth. The greatest disease of man is his mind which requires treatment otherwise there is no escape from scarcity and sorrow. The treatment of the mind consists of intense self-effort and following instructions from a self-realized, Brahmanistha Guru.

Bhakta: My Lord! What is truth?

Mahatma: The totally opposite of the previously mentioned falsehood is truth. That or he who remains the same before creation, at present and after creation is the only truth. My son! The world is that which is perceived by the mind. Hence that which is beyond the gross vision or the visible world is also beyond the mind, and that is the truth. This truth is the supreme religion, it is the true tapasya, truth is a great virtue, it is the real friend, truth is the direct Brahman and the true essence of this world. When man is fixed in this path of truth, the religion of truth, and the devotion of truth, he is never baffled by the fallacies of the world, nor is he deprived from the bliss of the immortal self. *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(29)

Spiritual aspirants who are limited by their dearth of devotion are advised to embrace the eight-fold path of yoga.

However, people capable of treading the knowledge-dominated path are rare. A seeker should resort to any of the available paths to salvation based on his inherent aptitude as determined and directed by his Spiritual Master (*Sadguru*). The Bhagavad Gita has also prescribed numerous meditative paths among which the path of devotion has been emphasized as one of the most significant. All these paths may potentially lead to the enlightenment of Knowledge. It is very difficult to absorb this obscure and esoteric knowledge without an attitude of surrender on the Guru (spiritual Master) and God. Thus, the Bhagavad Gita has proclaimed—

"Tad-viddhi pranipatena
pariprashnena sevaya
Upadeksyanti te gyanang
gyaninas-tattva-darsinah."

Meaning: This knowledge should be learned by accepting a spiritual master and by submissive inquires and rendering

service unto him. The enlightened self-realized Saint endowed with divine realization can impart the knowledge of wisdom unto you.

Knowledge can either be acquired from external sources (*paraksha*) or internally assimilated (*aparaksha*). As enunciated through self-realized philosophy, the essential principles should first be acquired externally from the Guru's mouth and then in time, truth-lit knowledge blossoms within. Here, the word *tattva-darshi* refers to the self-realized Seer. The essential tenets of wisdom should be received only from the *tattva-darshi* prophet. A person who does not possess insightful realization on a certain discipline is not authorized to advice on that subject. Externally received unassimilated knowledge is essentially equivalent to devotional ignorance. Such ignorance has the critical drawback of diverting a seeker's objective focus causing him to easily falter in his path of penance. The ignorant is blind while the enlightened may be considered revealed and sighted. This can also be considered similar to the difference between two individuals, one of whom carries a lighted lamp while walking in a dark night, while the other does not. The path of Truth is marked by the confluence and coexistence of devotion (*bhakti*) and knowledge (*gyan*).

Creation cannot be realized by the supreme Consciousness (*Chaitanya*) without the involvement of the eternal Divine Force (*Shakti*). Consciousness and the Divine Force remains in harmonious union and realizes the activities of creation, sustenance and destruction. The Holy Scriptures have sometimes mentioned Consciousness and at other places attributed the Divine Force, as the causal source of the cosmic expression. It should however be understood that wherever *Chaitanya* has been attributed as the origin of creation, the actual intention is to signify *Shakti*-conjoined *Chaitanya*. Similarly, wherever the scriptures say that cosmic manifestation commences from *Shakti*, they actually intend to convey *Chaitanya*-blended *Shakti* as the origin of creation. Hence, the essential meaning is same. The Divine Force never remains singular, Consciousness is Her eternal shelter. The Divine Force is enshrined within and blended as a part of the Universal Consciousness.

Relatively recent streams of thought on the *Sankhya-yoga* has opined that *Shakti* has an independent existence distinct from *Chaitanya* and that this *Chaitanya*-separated-*shakti* is the source from which the Universe has originated. However, this hypothesis has been declared to be incorrect and contradictory to the view of the *Shruti*, by *Maharshi Ved-vyas* in the text *Vedanta Darshan*. The original beliefs of the *Sankhya* and *Yoga* have been appreciated by the *Shruti* and is not in conflict to it. However, subsequent modified presentations of these thoughts have been proclaimed to be inconsistent to the *Shruti*'s idea. However, it should be recognized that refutation of a particular notion within a stream of thought does not automatically nullify the validity of its entire philosophy.

As a further illustration, consider the sects which accept the Primordial Divine Force as their cherished deity of worship. They do not contemplate on non-spontaneous nature (*jara-shakti*), but rather meditate on *chetan-shakti* or the spontaneous nature. Herein lies *Ishwaratwa*-–the true essence of spirituality. All communities prescribe worship of their cherished Deities as God. When such worship is conducted by ascribing qualifications associated with the Deity in accordance with the divine spiritual scriptures, it may be considered as essentially the revered contemplation of the One Universal God-–the *Brahman*. The cherished deity should be contemplated with

ascribed qualities of the One Universal *Brahman*. Only then will such contemplation result in complete and absolute enlightenment. Otherwise, the penance will only lead to partial and incomplete spiritual realization. It is therefore only the One and same Universal God who is contemplated upon through a variety of forms, procedures and idols. This is rather the objective of the scriptures and should not be considered as a lapse in comprehension. Further, this cannot be labeled as idolatry as worship of non-spontaneity is never intended in them—there is no wrong when the inanimate is worshipped by ascribing *Brahmic* qualifications onto it. *...to be continued*

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Unmesh

[Soul's Blooming - Part IV]

Sree Sree Maa Sharbani

Sree Sree Maa in Conversation...

On the Glory of Places of Pilgrimage: “The ‘Sree’ (intrinsic beauty, true wealth) or Madhurya of holy places are its Mahatmas (great souls) and sanctified temples of the presiding Gods, while the ‘Sree’ or Madhurya of the world is the natural beauty of the universe. The physical embodiment of a Mahatma is itself a temple of the Supreme Divine. The darshan (sight) and presence of a Mahatma makes a holy pilgrimage truly successful. By the grace of such great personalities, one can feel the divinity of holy places. Often residing in anonymity in such places, Mahatmas extend help to seekers and practicing aspirants striving along the spiritual path.

Once, in the early part of my spiritual life, I went to Puri. While staying there, one morning, when I was engrossed in a deep meditative state of spiritual consciousness, Andhababa Sadhu Sitaram of Hazaribagh appeared in my vision and explained the divine glory of Lord Sri Sri Jagannath. During that period I experienced many miraculous incidents throughout the day. By the infinite grace of Mahatma Sri Sri Andhababa, who is ever free from earthly attachments, I was able to realize and internally assimilate the yogic tatwa (essential nature and fundamental principles) of the Sri Sri Jagannath-Balaram-Subhadra trinity. Subsequently when we went to the Sri Jagannath temple for darshan, a beggar suddenly appeared before me and asked for alms while I was standing near the shops in front of the temple. I observed that he was a leper with ghastly distorted and diseased fingers. At first, a faint trace of aversion came to my mind but immediately someone spoke inside my heart – “If one has a feeling of aversion he or she can never get darshan (visualization) of the Supreme Lord, not in any day or at any time”. These words struck like a flash of lightning. As I looked up at the beggar’s face and tried to hold his hand, I saw that he was staring at me. No sooner had I touched his hand, he jerked it off and ran away into the crowd. I could not make out where he disappeared within a moment. Right away I understood that I had just received a darshan of Sri Jagannath-dev. Lord Jagannath had removed the sense of contempt and disdain from my heart forever. It is at this same pilgrimage of Puri five centuries ago that Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya had cured a leper by embracing him. Gratefully I began to contemplate on the infinite grace and love of the Lord. Later, I went to the Gambhira (Chaitanya Mahaprabu’s sadhana arena) to pay my homage. *...to be continued*

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(8)

The initiation by Guru:

"Sadguru pawe, bhed bataoye,
gyan kare upadesh,
Tab koela ki maila chute,
jab aag kare prabesh."

In this way, Manicklal spent quite a long time in Bhutnathbabu's house. The auspicious arrival of 'Gandhababa' i.e. Sri Sri Vishuddhananda Saraswati Paramhansa took place in the ashram, located in the park adjacent to Bhutnathbabu's house. Manicklal being very eager to receive initiation from Gandhababa, expressed his earnest desire which 'Gandhababa' sternly refused. Manicklal was greatly dejected at this unexpected refusal and said softly, 'I am Subarnabanik by caste, which is low-born; hence he might have rejected me.' 'Gandhababa' being aware of the sorrow and regret of Manicklal, pulled him to his lap and said tenderly with lot of affection, "I will not initiate you. A mahapurush (great saint) has been fixed for you, he will appear on a predetermined day and time." Though Manicklal was a bit consoled at this remark of Gandhababa, he said with a tint of doubt, "I could get initiation in your pious company, how come some other Guruji come for me in future?" Gandhababa repeated, "Its okay, my son, listen to my prophecy." The infallible words of the great saint took a remarkable shape in Manicklal's life and this he used to narrate us off and on with an emotional temperament.

Prior to Gurudiksha, Manicklal had felt the divine present of the eternal mother. Manicklal's days passed off in utmost contentment with regular company of saints and savants till midnight, gentle walk in the evening along the greeneries in the western part of Kanu junction and the cordial hospitality at Bhutnathbabu's house. It has already been said before that Manicklal was extremely fond of solitude since his childhood. He used to roam alone in the desolate fields adjacent to Kanu junction in the evening and with the immortal words of 'Gandhababa' in his heart, he used to wait eagerly for the grace of an unknown mahapurush.

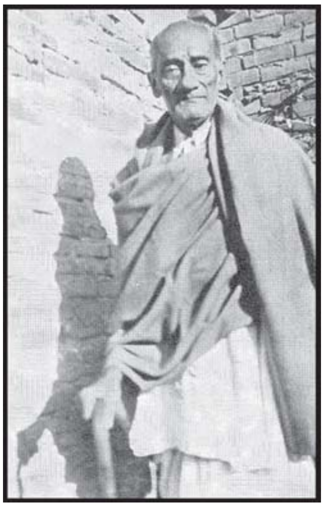

One evening, Manicklal was attracted by the serious and grave voice of a mahapurush who was standing beneath a nearby banyan tree and was having some beard, moustache, serene and quiet countenance, fair complexion and unique personality (aged around 19 or 20 years) "Manicklal, come here, I have called you. Manicklal was momentarily clouded by the thought of how a completely unknown man know his personal details and call him but then he tore this cloud of thought apart and went to the mahapurush below the banyan tree. As he reached his proximity, the mahapurush said, "I have come to initiate you and that will be done tomorrow morning. After bath, come with new asana and a haritaki (harad) if possible, otherwise nothing is needed." After this instruction, Manicklal was spell bound and he prostrated at his feet. When he raised his head after prostration, he found that the

divine personality has disappeared. Manicklal's mind was flooded with the pleasant thought of initiation, for which he had been so eager and even approached Vishuddhananda Paramhansa once. He was also spell bound with the prophecy of 'Gandhababa' coming true and he returned to Bhutnathbabu's house and narrated him the entire incident serially with delight. Bhutnathbabu was also thrilled at this joyful news and started collecting the materials for Manicklal's initiation the next day.

The auspicious night passed off quickly with the blissful feelings of the imminent expectation. After bath in the early morning, Manicklal wore a new silk cloth and came alone anxiously at the designated spot beneath the banyan tree with an asana and harad. He saw the neat and radiant, divine mahapurush was already present there. As soon as Manicklal reached there, he instructed him to sit on the asana in front of him. As Manicklal sat, he positioned his divine right hand on the vertex of Manicklal's head and said, "Here I initiate you." After initiation, Manicklal offered his devotional prostration at the lotus feet of the mahapurush with tearful eyes and expressed his desire to accompany him to his ashram. The mahapurush refuted his request. He proclaimed the prohibition by saying, "You have to stay in the samsara, you have work there. The people of the world with the three kinds of affliction (spiritual, material and supernatural) will come to you in search of the personification and the existence of God, when your activity will be called for. Do not doubt on your capability. Everything is possible by the divine." Afterward Manicklal humbly said, "Neither I know your residence, nor are you aware of my whereabouts, under such circumstances, how do I acquire the fortune of your darshan in future?"

The radiant divine mahapurush replied, "I know your residence but it is not possible for you to know my whereabouts. I have come through the astral path of sky. I will come when you call me, but never call me without some definite purpose; rather I shall confer you my darshan in future by gauging the necessity." He also added, "It was because of my will that you have come to Kanu junction and taken shelter at Bhutnathbabu's house." On expressing the agony of staying in the samsara and the multiplicity of problems to his Guru, the great Guru blessed him with affection, "You will get everything at your vicinity as soon as you think of any requirement of samsaric life." After this, Manicklal once again showed his obeisance at the holy feet of his worshipful Sri Guru and took permission for returning when he saw, like the previous day his adorable Sri Guru has disappeared. Manicklal became morose for a while at the disappearance of his Gurudev. His mind became full to the brim with gratitude towards the great saint Visuddhananda Paramhansa. Thereafter, he returned to Bhutnathbabu's house, narrated him the sublime incident of his initiation by the holy master and became immersed in the splendor of ineffable bliss.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English

by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

There is nothing mind can do that cannot be better done in the mind's immobility and thought-free stillness. When mind is still, then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence. —**Sri** Aurobindo

News in Brief

10th - 19th October - The 27th Navaratri Durga Puja was organized at the Ashram premises. The different functions including puja, yajna,

Guru-brother Dr. Barun Dutta welcomes Swami Chetananandaji at the Ashram, during Durga Puja

distribution of prasad etc. were performed flawlessly. On Panchami in the morning, Sree Sree Maa distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 500 villagers. An absorbing cultural programme was conducted in the evening where a dance recital was presented by the pupils of Sri Giridhari Nayak. The earlier issue of Hiranyagarbha was released on this evening. On the day of Saptami, the evening program started with a dance performance by three child artists Bidisha Saha, Shraddha Dasgupta and Samadrita Basu. The Ashramites also presented a beautiful musical programme. On Mahastami, a bhandara was organized on the holy occasion of the death anniversary of Sri Lahiri Mahasaya. On Navami, mahaprasad of Sri Sri Durga Devi was distributed.

24th October - On the occasion of Sree Sree Kojagari Purnima, Sri Yajnanarayan-da performed the puja of Sri Sri Lakshmi Janardanjiu at Sree Annapurna Kshetra. After puja, yajna was held at the Ashram.

4th November - In the morning, Sree Sree Maa distributed clothes to more than 500 villagers. Along with this they were also offered sweets and biscuits.

6th November - On the occasion of Deepavali, the Ashram was glowing with lights and diyas along with a beautiful Rangoli. At midnight, Sree Sree Maa performed the puja of Maa Devi Tarakalika at the Ashram.

17th November - On the occasion of Sri Sri Jagaddhatri Puja, prasad was offered at the Annapurna Kshetra.

23rd November - On the occasion of Raas Purnima, offerings were made to Sri Sri Radha Madhav followed by distribution of prasad. In the evening, Sree Sree Maa herself presented some beautiful bhajans.

25th November - On this day, warm blankets and winter wear were distributed among many poor villagers in the locality. The Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held in the evening at the Ashram premises.

1st - 8th December - Sree Sree Maa alongwith some disciples spent the week in Varanasi. During her stay Sree Sree Maa also visited Naimisharanya.

15th - 16th December - Worship of Sree Annapurna Mata and Sri Vishweshwar Shiva was conducted on 15th December. Sree Sree Maa herself distributed prasad among the children. A program of bhajans was conducted in the evening at Annapurna Kshetra. On 16th morning, worship of Sree Lakshmi Janardanjiu was held and prasad was distributed.

25th December - On the 29th session of the 'Adhyatmik Sabha', our brother disciple Dr. Barun Dutta continued his profound analytical discourse on the Kathopanishads.

28th December - On the occasion of Sree Maa Sarada Devi's earthly sojourn, some pupils of Hotor Ashram visited Akhanda Mahapeeth and paid their homage to Sree Sree Maa. In the evening, an absorbing cultural programme was conducted by the pupils of the Hotor Ashram. In the second half of the program Smt.Paripurna devi, daughter of Sri Abhayji presented some mesmirising devotional songs composed by Sri Abhay-ji.

30th December - On this morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the on Kriyayoga.

Forthcoming Events

Dol Purnima: 21st March, Thursday
Spiritual Congregation: 24th March, Sunday
Annapurna Puja: 13th April, Saturday
Ram Navami: 14th April, Sunday
Bengali New Year: 15th April, Monday